Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নওশিন তাবাসসুম

রোলঃ 23090120978

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নওশিন তাবাসসুম

রোলঃ 23090120978

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম কি ও কেন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নওশিন তাবাসসুম, আইডিঃ 23090120978 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম কি ও কেন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

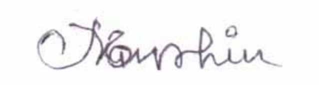

(স্বাক্ষর)

নওশিন তাবাসসুম

আইডিঃ 23090120978

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ... 5

১.১ শুরুর কথা ... 5

১.২ সমস্যার বিবৃতি ... 7

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ... 7

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন ... 8

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব ... 8

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি ... 10

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামের পরিচয় ... 11

২.১ সত্যের সন্ধানে ... 11

২.২ অভিধানের ভাষায় ইসলাম ... 15

২.৩ কুরআনের ভাষায় ইসলাম ... 15

২.৪ হাদীসের ভাষায় ইসলাম ... 16

২.৫ ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ... 18

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামী জ্ঞানের উৎস ... 20

৩.১ কুরআনুল কারীম ... 20

৩.২ হাদীসে রসূল ﷺ ... 24

৩.৩ সীরাতে রাসুল ﷺ ... 27

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী বিশ্বাস ... 30

৪.১ ঈমানের পরিচয় ... 30

৪.২ ইলাহ ... 31

৪.৩ ফেরেশতাগণ ... 34

৩.৪ কিতাবসমূহ ... 36

৪.৫ রসূলগণ ... 37

৪.৬ পরকাল ... 39

৪.৭ তাকদীর ... 42

৪.৮ ইসলাম বনাম নাস্তিকতা ... 45

পঞ্চম অধ্যায়: ইসলামে ইবাদত ... 50

৫.১ পবিত্রতা ... 50

৫.২ নামায ... 52

৫.৩ যাকাত ... 54

৫.৪ রোযা ... 58

৫.৫ হজ্জ ... 62

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামী শরীয়ত 66

৬.১ শরীয়তের পরিচয় 66

৬.২ শরীয়তের উৎস 67

৬.৩ শরীয়তের শাখা........ 72

৬.৪ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য 76

৬.৫ শরীয়তের বৈশিষ্ট্য........ 78

সপ্তম অধ্যায়: ইসলাম ও শিক্ষাব্যবস্থা........ 81

৭.১ ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ 81

৭.২ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষত্ব........ 83

৭.৩ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বনাম আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা 85

৭.৪ ইসলামী স্বর্ণযুগের বিজ্ঞানীদের অবদান 87

৭.৫ ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান 89

অষ্টম অধ্যায়: ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি........ 92

৮.১ ইসলামী স্বাস্থ্যবিধির পরিচয় 92

৮.২ সুন্নাহ লাইফস্টাইল........ 93

৮.৩ হালাল ও হারাম 96

নবম অধ্যায়: ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য 98

৯.১ ইসলামী বাণিজ্যের ভিত্তিমূল 98

৯.২ বিক্রেতার দায়িত্ব........ 100

৯.৩ ক্রেতার দায়িত্ব........ 102

৯.৪ বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী 104

দশম অধ্যায়: ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা 105

১০.১ ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো........ 105

১০.২ ইসলামী রাষ্ট্রে শাসকের ভূমিকা 106

১০.৩ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা 106

১০.৪ অমুসলিম নাগরিক ও তাদের অধিকার 107

১০.৫ ইসলামী রাষ্ট্রে দণ্ডবিধি........ 107

১০.৬ ইসলামী দন্ডবিধি সম্পর্কে কিছু কথা........ 108

১০.৭ সেকুলারিজম বনাম ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা 110

একাদশ অধ্যায়: ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা........ 112

১১.১ বিবাহ 112

১০.২ ইসলাম ও একাধিক বিবাহ 112

দ্বাদশ অধ্যায়: ইসলামে নারী ও পুরুষ 115

ত্রয়োদশ অধ্যায়: ইসলামে দাওয়াত ও জিহাদ........ 117

১৩.১ দাওয়াত ও তার প্রাসঙ্গিকতা 117

১৩.২ জিহাদ ও তার প্রাসঙ্গিকতা 117

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ইসলাম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা 119

পঞ্চদশ অধ্যায়: উপসংহার 122

তথ্যসূত্র 123

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العٰلمين .وصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .اما بعد :

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ শুরুর কথা

“আমরা ছিলাম অজ্ঞতা অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম।

এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবতার জীবনযাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রসূল প্রেরণ করলেন। তার বংশ মর্যাদা সততা সহনশীলতা সংযমশিলতা ন্যায় নিষ্ঠা পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকে আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবত আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সেসব বর্জন করব। অধিকন্তু, মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া, মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সাথে শরিক করা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দান করেন। সালাত রোজা এবং যাকাতের জন্য তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।

এই পয়গম্বরকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর রসূল বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তার আনীত দ্বীনে ইলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ

এবং তদীয় রসূলের পয়রবী করে চলছি। সুতরাং, আমরা এক এবং অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না এবং বিশ্বজাহানে কোথাও তাঁর কোনো শরিক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। রসূল যেসব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধ জেনে তার সদ্ব্যবহার করছি।" [১]

قُلۡ یٰعِبَادِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوۡا رَبَّکُمۡ ؕ لِلَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا فِیۡ ہٰذِہِ الدُّنۡیَا حَسَنَۃٌ ؕ وَاَرۡضُ اللّٰہِ وَاسِعَۃٌ ؕ اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَہُمۡ بِغَیۡرِ حِسَابٍ

অর্থঃ বল, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! অন্তরে তোমাদের প্রতিপালকের ভয় রাখ। যারা এ দুনিয়াতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের সওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত। [সূরাঃ আয্-যুমার ৩৯:১০]

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে নবী করীম ﷺ এর ওপর এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার মুশরিকদের জুলুম-নিপীড়নে জর্জরিত, অত্যাচারিত মুসলিমগণ হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আল্লহর রহমতে সেখানে তাদের জান-মাল ও ইমানের নিরাপত্তা লব্ধ হয়। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী মুসলমানদের তার দরবারে ডেকে নেন এবং জানতে চান কী সেই ধর্ম, যার কারণে তারা নিজ দেশে ছেড়ে আজ বাদশাহ নাজাশীর দেশে এসেছেন। তখন রসূলে পাক ﷺ এর চাচাতো ভাই জাফর ইবন আবি তালিব রা: উপরোক্ত ভাষণের মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরলেন। আলোচ্য গবেষণাপত্রে ইসলামের পরিচয় শুরু করার জন্য আমি সেই বর্ণনাই দারস্থ হলাম।

অধিকাংশ মানুষ এমনকি অনেক মুসলমান পর্যন্ত এই ধারণা পোষণ করে যে ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য। কিন্তু এমনটা নয় বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কেবল মুসলমানদের রব নন বরং তিনি رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক (সূরা ফাতিহা ১:১)। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কেবল আমাদের নবী নন বরং তিনি সারা জাহানের জন্য প্রেরিত রহমত স্বরূপ, رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ (সূরা আম্বিয়া ১০:১২৭)। সুতরাং, নবী ﷺ এর আনীত দ্বীন ইসলাম সারা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য। এজন্য মানবসন্তানের জন্য ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

এই গবেষণাতে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে যেন পাঠকের সামনে ইসলাম কী, কী তার শিক্ষা এর সঠিক চিত্রায়ন হয়। আর এই শিক্ষা গ্রহণের মাঝে পাঠকের কি ফায়েদা রয়েছে তা যেন পাঠকের বুঝে আসে। তার মানসপটে যেন ভেসে ওঠে সেই ইসলাম যা আমরা আল্লহর রসূল ﷺ এর থেকে পেয়েছি। যেন সে শয়তানের ধোঁকায় পড়েকোনো বিকৃতপন্থী, শত্রুর উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে ইসলামকে ভুল না বোঝে সেই প্রয়াসই চালানো হয়েছে এই গবেষণায়। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সহায় হোন, আমাদের জন্য সহজ করে দিন এবং আমাদেরকে ইসলামের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ ٢٥وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۙ٢٦وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ ٢٧يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۪
٢٨

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে। [সূরাঃ ত্বা-হা ২০: ২৫- ২৮]

১.২ সমস্যার বিবৃতি

ইসলাম কি এবং কেন আমরা তা মানবো

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۣ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলাম [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:১৯]

নিঃসন্দেহে ইসলামই সেই ধর্ম যা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কর্তৃক মনোনীত এবং রসূল ﷺ এর ওপর নাযিলকৃত। অনিশ্চিত এই দুনিয়ার জীবনকে সর্বোত্তম রূপে ব্যবহার করে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান লাভ করার উপায়ই হল ইসলাম। এর মাঝেই রয়েছে সেই golden method বা স্বর্ণালী পন্থা যার অনুসরণে মানুষ লাভ করতে পারে মহাসাফল্য, জান্নাত।

কিন্তু মানুষের চিরশত্রু শয়তান তো কখনোই চায় না যে মানুষ আল্লহর আনুগত্য করে এবং জান্নাত পায়। তাই সে বিভিন্ন ধোঁকাবাজির মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনকে মানুষের সামনে শোভনীয় করে তোলে। মানুষ তখন আল্লহকে ভুলে গিয়ে শয়তানের দেখানো পথে চলতে শুরু করে এবং পথভ্রষ্ট হয়। এই মানুষগুলোর কতক তো হয় অমুসলিম আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কতক মুসলিম। তখন তাদের মনে বাসা বাঁধে নানা প্রশ্ন, স্বীয় সম্পর্কে তাদের যতটুকু জ্ঞান ছিলো সেটাকেও তারা মনে মনে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করে। চেনা ইসলামকেও তখন কেমন যেন অচেনা মনে হয়।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সকল মানুষের সামনে দ্বীন ইসলামকে তুলে ধরা। তাই এখানে ইসলামের পরিচয়, কিভাবে একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে, কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কোন কাজগুলো করা তার জন্য আবশ্যক, দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বা কর্মপন্থা কেমন হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, একজন মুসলিম ব্যক্তি কিভাবে তার জীবন পরিচালনা করে, কিভাবে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, ইসলাম পালনের মাধ্যমে কি কি সুযোগ-সুবিধা লাভ হয় ইত্যাদি বিষয়াদি এই গবেষণাপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের কিছু সাধারণ জিজ্ঞাসার উত্তর। যেমন: দাওয়াতের প্রাসঙ্গিকতা, জিহাদ আসলে কী, ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামভীতি শব্দটি কিভাবে এলো, এটা কতটা যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি বিষয় এই গবেষণাপত্রে আলোচনা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

কলেবরে ক্ষুদ্র হওয়ায় সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব হবে না। কারণ ইসলামের যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পাতার পর পাতা আলোচনা করা যাবে। তাই এখানে ইসলামের প্রায় সকল দিকগুলোর সার-নির্যাস তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যেন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে পাঠক একটি সুধারণা পোষণ করে এবং ইসলামের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর যে ইতিমধ্যে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে সে যেন আরো উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে আগ্রহী হয়। সর্বোপরি সে যেন অর্জন করে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত, যা চিরস্থায়ী আবাসস্থল।

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণাপত্রে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর তুলের ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। ইসলাম কী?

২। কেন ইসলাম মানবতার জন্য অপরিহার্য?

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব

ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকেই মানব ইতিহাসে এক অনন্য স্থান করে নিয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম সবার মনেই এক অন্যরকম অনুভুতির সৃষ্টি করে এই শব্দটি - হয়ত ভয়, বা কৌতূহল, অথবা আগ্রহ কিংবা ভালবাসা। কারো কাছে এটা ছাপার অক্ষরে লেখা নিকছ একটা শব্দ মাত্র আর কারো কাছে এটা তার সমস্ত জীবন, তার পরিচয়।

যারা একে ভয় পায়, ঘৃণা করে তারা চায় বাকি সবাই তাদেরই মতো একে ভয় পাক, ঘৃণা করুক আর চায় যারা একে ভালবাসে তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দিক। আর যারা একে ভালবাসে, তারা কেমন? তারাও কি চায় যারা ঘৃণা করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে?

অবাক করা বিষয় হল, না, তারা এমনটা চায় না। বরং, তারা চায় ওরাও ইসলামকে চিনুক, বুঝুক, ভালবাসুক। কেন তারা এমনটা চায়? তারা বলে এটা নাকি ইসলামেরই শিক্ষা। বড় আশ্চর্যের বিষয়! কী এই ইসলাম যা মানুষকে একে অপরকে ভালবাসতে শেখায়? শত্রুদের কল্যাণ চাইতে শেখায় এক উত্তম পন্থায়? জানাটা যে ভীষণ জরুরী। এরই মাঝে লুকানো আছে সেই সোনালি চাবিকাঠি যার মাধ্যমে খুলে যাবে সব হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ। যেমনটা পবিত্র কুরআনে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ

অর্থঃ ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলে যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। [সূরাঃ হা-মীম আস-সিজদাহ্ (ফুছছিলাত) ৪১:৩৪]

বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় জনবৃহৎ ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। [৪] ইসলামকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ইসলাম কী এটা জানা আমাদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাছাড়া, ইসলাম সম্পর্কে এত জল্পনা-কল্পনা প্রচলিত রয়েছে

যে অনেক সাধারণ মুসলমানও অনেক সময় সন্দেহে পড়ে যান, প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না শুধুমাত্র ইসলাম সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে। অথচ যে ইসলামকে জানে, সে জানে এর সৌন্দর্য, এর উদারতা, এত দূরদর্শী এর কর্মপন্থা এবং বর্তমান দুনিয়ার জন্য তা কতটা কার্যকরী।

আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রযুক্তির অপব্যবহার, পরিবেশ বিপর্যয়, পরিবার ভাঙন, মানসিক সংকট ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। ইসলামী গবেষণার মাধ্যমে এসব প্রশ্নের নৈতিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাধান পাওয়া যায়। ইসলাম কখনো বিজ্ঞান-বিরোধী নয়; বরং জ্ঞান ও গবেষণাকে উৎসাহিত করে। কুরআনে প্রায় ৭৫০টির বেশি আয়াতে জ্ঞানচর্চা, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার নির্দেশ রয়েছে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। আধুনিক আইন ও আন্তর্জাতিক নীতিমালায় অনেক সময় ইসলামি ন্যায়বিচারের জায়গাগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয় না। ফলে মানুষ ইসলামী আইনের হিকমত উপলব্ধি না করে একে সেকেলে, বর্বর ইত্যাদি উপাধি দিয়ে বসে। গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি ফিকহ, শুরা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার ধারণাগুলোর আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা দেখানো যায়। এতে ইসলামি আইন প্রণয়ন বা শরীয়াভিত্তিক নীতি প্রয়োগে ভুল ধারণা দূর হয়।

ইসলামি গবেষণার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারে যে ইসলাম কেবল ইবাদতের নয়, বরং চিন্তা, জ্ঞান ও নৈতিকতার ধর্ম। এটি মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা, গবেষণার উদারতা এবং মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয় ও সভ্যতার পুনর্জাগরণে ইসলাম নিয়ে গবেষণার ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে আলোচিত, পর্যালোচিত এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে ইসলাম। ইসলামকে ঘিরে কাজ করে অসংখ্য কৌতুহল। কী এই ইসলাম? কেন তাকে নিয়ে এত আলোচনা? এই প্রশ্ন শুধু অমুসলিমগণ নয় বরং কাজ করে অসংখ্য সাধারণ মুসলমানদের মনেও। তাই বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গবেষণার বিষয় হচ্ছে ইসলাম। এরই ধারাবাহিকতায় অত্র গবেষণাপত্রের সূচনা।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাপত্রে যে গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো প্রাসঙ্গিক উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সহজীকরণ।

কুরআনুল কারীমে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা স্বয়ং এই পদ্ধতিতে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি উদাহরণ পেশ করার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যেন আমাদের জন্য সহজ হয় সুবহানাল্লাহ। বিভিন্ন সূরায় পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের জীবনী থেকে প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ঐ বিষয়বস্তুকে বোঝানোর জন্য। অনুরূপভাবে, কিছু সূরায় তিনি বিখ্যাত কিছু জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ঘটনা তুলে ধরেছেন। আবার কোথাওবা তিনি ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ ছাড়াই সাধারণ উপমায় কোনো শিক্ষা পেশ করেছেন। এবং তিনি বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

অর্থঃ বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি এমন কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে? [সূরাঃ আল ক্বামার - আয়াত নংঃ ৪০]

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামের পরিচয়

২.১ সত্যের সন্ধানে

খেজুর গাছের ওপর বসে মনিবের কাজে রত সালমান যখন খবরটা শুনলেন, তখন আনন্দ ও উত্তেজনায় তিনি এত বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন যে আশঙ্কা হচ্ছিল গাছ থেকে তিনি বুঝি পড়েই যাবেন। তার মনিবের চাচাতো ভাই মনিবকে বলেছে, " আল্লহ কায়লার বংশধরকে ধ্বংস করুন। ওরা এখন মক্কা হতে আগত এক ব্যক্তির চারপাশে ভিড় করেছে। লোকটি আজই এসেছে। ওরা মনে করে সে নাকি এ যুগের নবী"।

কায়লার বংশধর হচ্ছে ইয়াসরিবের প্রধান দুই গোত্র আওস ও খাজরাজ। খেজুর বাগানে ঘেরা মায়াবী মদীনার পুরোনো নাম ইয়াসরিব, যা পরবর্তীতে হয় মাদীনাতুর রসূল নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে, যাকে আজ আমরা সংক্ষেপে মদীনা নামে চিনি। এই সেই রসূল যার খবর শুনে বেসামাল হয়ে পড়েন সালমান। তবে কী তার দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান হতে চলেছে? কীসের প্রতিক্ষা? কে এই সালমান? কী বা তার কাহিনী?

"আমি ছিলাম এক পারস্য তরুণ। মধ্য ইরানের ইস্পাহান নগরীর জাইয়্যান গ্রামে ছিলো আমার বাস। আমার পিতা ছিলেন সেই গ্রামের সবচেয়ে বড় ধনী, সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনিই ছিলেন সেখানকার প্রধান ব্যক্তি। বাপ-দাদার ধর্মের অনুসারী হিসেবে 'অগ্নি উপাসনা'র ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে আমি প্রচুর সাধনা ও পরিশ্রম করি। সেই ধর্মের বিধি-বিধান আগ্রহের সঙ্গে মেনে চলায় চারদিকে আমার প্রচুর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উন্নতির ধারাবাহিকতায় একসময় উপাসনালয়ের প্রধান হিসেবে দিনরাত প্রজ্জ্বলিত করে রাখার গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধেই ন্যস্ত করা হয়।"

এই কাহিনী রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (র:) এর। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ অগ্নি উপাসক। তার পিতার ছিলো বিশাল ভূ-সম্পত্তি। একবার জরুরী কাজে ব্যস্ততার কারণে তার পিতার পক্ষে ফসলের ক্ষেতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না দেখে তিনি তাকে তার হয়ে দেখাশোনার জন্য পাঠালেন। কিন্তু পথিমধ্যে তার সামনে আসে খ্রিস্টানদের একটি গীর্জা যেখানে তখন উপাসনা চলছিলো। সালমান সেই আওয়াজে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মনে হল,'তাদের

ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো'। তার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসলো। তিনি খোঁজ নিলেন,
"এই ধর্মের মূল কেন্দ্র কোথায়?"
তারা বলল, "সিরিয়ায়।"

সারাদিন তাদের মাঝে কাটানোর পর বাড়িতে গিয়ে বাবাকে যখন এই ঘটনা খুলে বললেন, বাবা বললেন, "বেটা! হঠাৎ জেনেছ বলে ঐ ধর্মের প্রতি তুমি একটু বেশি মুগ্ধ হয়ে পড়েছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই ধর্মের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই আর আসল সত্য এটাই যে তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ও তার চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।"

সালমান দৃঢ়ভাবে তার বক্তব্য প্রত্যাখান করলেন, বললেন, "তোমার কথা একেবারেই অবাস্তব বাবা! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আমাদের ধর্মের চেয়ে অনেক ভালো।"

বাবা তখন তার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়ে তাকে গৃহবন্দী করলেন এই ভয়ে যে ছেলে অন্যের দ্বীনে চলে না যায়। কিন্তু সত্য ধর্মের খোঁজে ব্যাকুল সালমান দমে যাবার পাত্র নন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি খ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং উপযুক্ত সময়ে সিরিয়াগামী এক কাফেলার সাথে যুক্ত হয়ে সিরিয়া পৌঁছে গেলেন দ্বীনের দীক্ষা নিতে। সেখানকার লোকজনদের কাছে জানতে চাইলেন,
"খ্রিস্টধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বর্তমানে কে?"
তারা জানালো, "গির্জার দায়িত্বে নিয়োজিত বর্তমান বিশপই খ্রিস্টধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

এরপর সালমান সেই বিশপের কাছে গেলেন। তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। বিশপ তাকে সাদরে গ্রহণ করলেও অল্প দিনের মাঝে তার কর্ম পন্থায় সালমান বুঝে ফেললেন, এই বিশপ ভালো মানুষ নন। তিনি অনুসারীদেরকে দান-খয়রাতে উদ্বুদ্ধ করেন অথচ তারা যখন তাদের অর্থ তার হাতে তুলে দেয়, তখন তিনি সেগুলো গরীব-দুঃখীদেরকে না দিয়ে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন! যখন লোকটি মারা গেলো, খ্রিষ্টানরা সমবেত হলো তাকে চিরবিদায় দেয়ার জন্য। সালমান তাদের সামনে লোকটির মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন, প্রমাণস্বরূপ তাদেরকে দেখালেন সোনা-রূপাপূর্ণ সেই সাত কলস যাতে ঐ বিশপ লোকেদের অর্থ-সম্পদ জমা করেছিলো। সমবেত জনতা বিশপকে দাফন না করে তার মৃতদেহকে শূলে চড়ালো এবং তার উপর পাথর ছুড়ে মারলো।

এরপর যে লোকটিকে যাজক নিযুক্ত করা হলো তিনি ছিলেন একজন খাঁটি লোক। দুনিয়াবী বিষয়ে তার কোনো লোভ বা মোহ নেই। তিনি দিন-রাত ইবাদতে মগ্ন থাকেন, আখিরাতের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। এত ভালো একজন ধর্মপ্রাণ মানুষকে পেয়ে সালমান তার সেবাযত্নে মনোযোগী হলেন। কিছুদিন পর যাজকের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন,

"জনাব, আপনার ইন্তেকালের পর আমি কার কাছে যাব, কার সহচর্য অবলম্বন করব? এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ উপদেশ চাই।"

তিনি বললেন, "বেটা, খ্রিস্টধর্মের যে মৌলিক নীতি-আদর্শের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, মুসলের এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সেরকম আছে বলে আমার জানা নেই। তিনিও আমার মত ধর্মের কোন বিকৃতি ঘটাননি। সুতরাং তুমি তার কাছে চলে যেও।"

এই যাজকে মৃত্যুর পর সালমানের মুসেলের লোকটির কাছে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনিও মারা গেলেন। মারা যাওয়ার আগে তিনি নসিবাইনের এক ব্যক্তির সন্ধান দিয়ে গেলেন। নসিবাইনের যাজকের কাছে অল্প কিছুদিন থাকার পর সালমান বুঝতে পারলেন পূর্বের দুজনের মত এই বুযুর্গ-ও অত্যন্ত সৎ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। কিন্তু তার কাছ থেকে তিনি খুব বেশি উপকৃত হতে পারলেন না, অল্প দিনের মধ্যে তারও মৃত্যুর সময় এসে গেল। সালমান তাকে বললেন,

"আমার সম্পর্কে আপনার তো সবই জানা আছে - আমার লক্ষ্য কী, কিসের জন্য আমি এখান থেকে ওখানে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছি। সুতরাং আপনার মৃত্যুর পর আমি কার কাছে যাবো এ বিষয়ে কিছু বলে দিন।"

তিনি আম্মুরিয়ার এক বুযুর্গের খোঁজ দিলেন। তার মৃত্যুর পর সালমান আম্মুরিয়ায় চলে আসলেন এবং আম্মুরিয়ার যাজকের সাথে থেকে ধর্মভীরুতা ও নীতিশিক্ষা করতে থাকলেন। পূর্ববর্তীদের ন্যায় একসময় এই যাজকেরও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। যথারীতি সালমান তার কাছে পরবর্তী শিক্ষকের বিষয়ে নির্দেশনা চাইলেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে বললেন, "বেটা! আল্লহর শপথ, আমার জানামতে এই বিশাল পৃথিবীর বুকে এখন এমন কেউ বেঁচে নেই যিনি আমাদেরই মত সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে আশার কথা এই যে, খুব শীঘ্রই আরবভূমিতে আত্মপ্রকাশ করবেন এক মহান নবী, যিনি ইবরাহীম (আ:) এর দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি দুই মরুর মাঝে খেজুর বাগানে পরিপূর্ণ জায়গায় হিজরত করবেন। তার নবুওয়াতের বেশ কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকবে, যেমন: তিনি নিজের জন্য

হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করবেন, খাবেন। কিন্তু সাদাকা-যাকাত নিজের জন্য গ্রহণ করবেন না, খাবেন না। তার মোবারক দুই কাঁধের মাঝখানে শোভা পাবে মহরে নবুওয়াত।"
পাদ্রী তার কথা শেষ করলেন এই বলে, "বেটা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে আমার মৃত্যুর পর সেই অঞ্চলে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়ো।"

আম্মুরিয়ায় থাকাকালীন সালমান অনেকগুলো বকরী ও গাভী পালতেন। যাজকের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন তিনি আম্মুরিয়াতেই থাকলেন। এরপর সুযোগমতো তিনি একদল আরব বণিকের সাথে চুক্তি করলেন যে, তারা যদি তাকে আরব দেশে পৌঁছে দেয়, তো তার গাভী ও বকরীগুলো তাদেরকে দিবেন। কিন্তু ওয়াদিল কুরা'য় (সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে) পৌঁছার পর তারা গাদ্দারীকে করে তাকে জনৈক ইহুদীর নিকট বিক্রি করে দিল। ঐ ইহুদীর খেজুরের বাগান দেখে তিনি ভাবলেন, হয়তো এটাই সেই আখেরী নবীর আবির্ভাব স্থান। তাই তিনি সেখানে থেকে কাজ করতে থাকলেন।

একদিন বনু কুরাইযা থেকে ইহুদী লোকটির এক আত্মীয় এল। সে সালমানকে কিনে নিয়ে চলে এল মদীনায়। মদীনায় পৌঁছে সালমান দেখলেন সেই খেজুর বাগানের দৃশ্য যা তার আম্মুরিয়ার উস্তায বর্ণনা করেছিলেন। তখন থেকে নতুন মালিকের সাথে তিনি মদীনাতে থাকতে লাগলেন। রসূলুল্লাহﷺ ততদিনে মক্কায় মানুষকে আল্লহর পথে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছেন কিন্তু গোলামী জীবনের ব্যস্ততা তার কাছে কোনো সংবাদ পৌঁছতে দিল না। এরই মাঝে নবীজী ﷺ মদীনায় চলে এলেন। একদিন বাগানে খেজুর গাছের মাথায় চড়ে সালমান মনিবের কাজে ব্যস্ত, মনিব তখন সেই গাছের নিচেই বসা। সেই সময়ে মনিবের চাচাতো ভাই এসে তাকে নবী ﷺ এর মদীনায় আগমনের খবর দিল।

এতো সেই নবীর সংবাদ যার সন্ধানে সালমান আম্মুরিয়া থেকে আরব ভূমিতে এসেছেন! সালমানের সারা দেহে প্রচন্ড কাঁপুনি শুরু হলো, তিনি ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়লেন। গাছ থেকে নেমে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কার কথা বলছিল। অমনি তার মনিব ঠাস করে তাকে একটি চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, "আরে! এটা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন? যা, তোর কাজে যা।"

পরবর্তী ঘটনা সরাসরি হযরত সালমান থেকে বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

সন্ধা ঘনিয়ে এলে আমি নিজের জমানো কিছু খেজুর নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তার কাছে হাজির হয়ে বললাম, "আমি জেনেছি, আপনি খুবই ভালো মানুষ। আপনার সঙ্গী-সাথীরা দেশ ছেড়ে এসে খাদ্য ও অর্থের অভাবে পড়ে গেছেন। আমার কাছে এই সাদাকার খেজুরগুলো ছিল। আমার কাছে মনে হল, আপনারাই এর বেশি হকদার।" এই বলে আমি তার সম্মুখে খেজুর গুলো রেখে দিলাম। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, "এই নাও.. তোমরা এগুলো খাও।" তিনি নিজে একটি খেজুরও খেলেন না, সবই সঙ্গীদেরকে দিয়ে দিলেন। এটা দেখে আমি মনে মনে বললাম, 'যাক, একটি আলামত মিলে গেল।'

এরপর আমি ফিরে এলাম এবং আবার খেজুর জমানো শুরু করলাম। পরবর্তী বার তার খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, "প্রথমবার বুঝতে পেরেছি আপনি সাদাকার খাবার নিজে গ্রহণ করেন না। এজন্য আপনার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিদর্শন স্বরূপ হাদিয়া হিসেবে এই খেজুরগুলো এনেছি।" এবার তিনি নিজেও খেলেন, সঙ্গীদেরকেও খেতে বললেন। আমি মনে মনে বললাম, 'দ্বিতীয় আলামতটাও মিলে গেলো।'

তৃতীয়বার তিনি যখন নবী ﷺ এর সাথে দেখা করলেন, তখন তিনি মদীনার কবরস্থানে একজন সাহাবীর দাফন কাজে অংশগ্রহণ করছিলেন। সালমান তাকে সালাম দিলেন, তারপর তার পেছনদিকে এসে দাঁড়ালেন, যেন আম্মুরিয়ার পাদ্রীর বর্ণনা মোতাবেক মোহরে নবুয়ত দেখতে পান। রসূল ﷺ তাকে বারবার তার পিঠের দিকে তাকাতে দেখে মতলব বুঝে ফেললেন। তিনি পিঠ মুবারক থেকে চাদর ফেলে দিলে। এবার তাকানো মাত্রই সালমান নবুয়াতের মোহরটি দেখতে পেলেন। সকল নিদর্শন মিলে যাওয়ার ফলে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। তিনি নবীকে চিনে ফেললেন এবং আনন্দে কাঁদতে থাকলেন। নবীজী ﷺ তার অবস্থা দেখে বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলেন, "তোমার ব্যাপার কী বলো তো?"

তিনি নবী ﷺ-কে তার পুরো কাহিনী শোনালেন। সত্যের জন্য তার দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী শুনে নবীজী ﷺ মুগ্ধ হলেন। নবীজী ﷺ এর আগ্রহের কারণে সাহাবীদের-ও পুনরায় তার কাহিনী শোনালেন। তারাও ভীষণ বিস্মিত ও মহাখুশি হলেন।

এভাবে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দয়া ও রহমতে সত্যের অনুসন্ধানী সালমান, নবীজীর প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (র:) পারস্যের ইস্পাহান থেকে সিরিয়া, সিরিয়া থেকে মুসেল, নসীবাইন, সেখান থেকে আম্মুরিয়া হয়ে ওয়াদীল কুরায় পৌঁছালেন। তারপর মদীনায় এলেন এবং নবীজীর সাথে মিলিত হয়ে ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত হলেন। যাত্রার শুরুতে তিনি

ছিলেন একজন অগ্নিপূজারী। কিন্তু তার মেহনত-মুজাহাদার উসীলায় তিনি আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার মনোনীত ধর্ম ইসলামের ওপর যাত্রা শেষ করলেন। সুবহানাল্লাহ। [৫][৬]

২.২ অভিধানের ভাষায় ইসলাম

ইসলাম শব্দটি আরবী سلم মূল ধাতু থেকে নির্গত, যা শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত। [৭]

আরবী الإسلام। শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা। ইসলামী পরিভাষায়, এক আল্লহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তার আনুগত্য করাই হলো ইসলাম।

মুসলিম (مسلم) শব্দটি الإسلام। মাছদার থেকে নির্গত ইসমে ফায়েল, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, যে আত্মসমর্পণ করে, অর্থাৎ আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সামনে নিজেকে সমর্পণ করে।

মুসলমান শব্দটি এসেছে মূলত ফারসী ভাষা থেকে। আরবী مسلم শব্দের সাথে ان প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে মুসলমান (مسلمان) শব্দটি, যা বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

আরবী مسلم শব্দের বহুবচন হচ্ছে مُسْلِمُوْنَ আর ফারসী مسلمان শব্দের বহুবচন হল مسلمانان (মুসলমানান)। যদিও, বাংলায় মুসলমান শব্দটিকে বহুবচনে মুসলমানরা আর মুসলিম শব্দটিকে বহুবচনে মুসলিমরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২.৩ কুরআনের ভাষায় ইসলাম

কুরআনুল কারীমে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের

জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সুতরাং এ দীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করো)। [সূরাঃ আল মায়িদাহ ৫:৩]

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে সেই দ্বীন যাতে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কর্তৃক মনোনীত সকল হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে আর কোনো রদ-বদল হবে না। এটি দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত রূপ। কাজেই, কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী বিধি-বিধান পালন করা। তাহলেই তারা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অনুমোদন লাভ করবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে।

অনত্র আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থঃ যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:৮৫]

অর্থাৎ, ইসলাম সেই পন্থা যার অনুসরণে মানুষ লাভ করবে আখিরাতের মহা সাফল্য এবং এর মাধ্যমে সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে এবং এটি ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়।

২.৪ হাদীসের ভাষায় ইসলাম

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فأسند رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ :الْإِسْلَامُ :أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ :صَدَقْتَ ...قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي» :يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ «؟ قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ» :فَإِنَّهُ جِبْرِيل أَتَاكُم يعلمكم دينكُمْ . «رَوَاهُ مُسلم

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল একেবারে ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তার মাঝে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। অথচ আমাদের মধ্য হতে কেউ তাকে চিনতেও পারেনি। অবশেষে লোকটি নবী (ﷺ)-এর খুব কাছে গিয়ে বসল- তাঁর হাঁটুদ্বয়কে রসূল (ﷺ)-এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে বসল এবং তার দু'হাত তাঁর দু'রানের উপর রাখল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রসূল (ﷺ) বললেন, ইসলাম হচ্ছে, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। নামায পড়বে, যাকাত দান করবে এবং মাহে রমজানের রোজা রাখবে। পথ খরচের সামর্থ থাকলে হজ্জব্রত পালন করবে'। লোকটি বলল- صَدَقْتَ আপনি সত্য বলেছেন।... অতঃপর লোকটি চলে গেল। তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। নবী করীম (ﷺ) আমাকে বললেন, হে উমার (রাযিঃ)! প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তিনি হলেন জিবরীল (আ)। তোমাদেরকে দ্বীন শিখানোর জন্য তিনি এসেছিলেন। (মুসলিম) [মিশকাতুল মাসাবীহ, ঈমানের অধ্যায়, হাদীস নংঃ ২][৯]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সে হিসেবে ইসলাম ব্যাপকার্থক। তা সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসে জিবরীল (আ:) এর প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর পেশ করেছেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদেরকে শেখানো। ইসলামের ব্যাপকার্থ সংক্ষেপে দু-চার কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, ইসলাম কি, তাহলে কিভাবে তার উত্তর দেয়া যায় তা-ই আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝে আসে। রাসুল ﷺ এর উত্তর থেকে দ্বীনের মৌলিক অংশগুলো আমাদের সামনে চলে আসে। সেকারণেই হয়ত ইমাম কুরতুবী (রহ) উক্ত হাদীসটিকে 'উম্মুস-সুন্নাহ' (সমস্ত হাদীস ও সুন্নাহ'র মূল) নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। [৮]

আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ আনুগত্যের নামই ইসলাম। এই আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে হতে পারে। আলোচ্য হাদীসে সেই পদ্ধতিগুলোর শীর্ষস্থানীয় অংশগুলোই আলোচনায় এসেছে। যেমন:

➢ ১। মৌখিক বহিঃপ্রকাশ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহﷺ - কালিমা পাঠ করার দ্বারা একজন মানুষ দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে। এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি মৌখিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ করে। তাওহীদ ও রিসালাতের এই সাক্ষ্য প্রদান হচ্ছে ঈমানের প্রতীক।

➢ ২। কর্মের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ: এর প্রতীক হচ্ছে নামায। প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে।

➢ ৩। অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে: আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমেও হতে পারে। এজাতীয় কার্যাবলির মাঝে অন্যতম হলো যাকাত

➢ ৪। কর্ম ও অর্থ উভয়টির সমন্বয়ে: ইসলামে এমন কিছু বিধান-ও রয়েছে যেগুলো পালন করতে হলে অর্থ ও শ্রমের সমন্বয় ঘটাতে হয়। এর অন্যতম উদাহরণ হলো হজ্জ।

➢ ৪। নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থেকে: ইসলামে শুধু কিছু কাজ করা নয় বরং কিছু কাজ করা থেকে বিরতও থাকতে হয়। এর অন্যতম প্রতীক হলো রোযা।

সুতরাং, আলোচ্য হাদীসে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও কেবল ৫টি আরকানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মূলত এই ৫টি আরকান ৫টি তরিকার প্রতিনিধিত্ব করে। আর, বান্দা এই ৫ উপায়েই মহান আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ

অর্থঃ আল্লাহ যাকে হিদায়াত দানের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দেন [সূরাঃ আল আনআম ৬:১২৫]

সুতরাং, আমরা দুআ করি,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থঃ হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তুমি তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫২২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ২১৪০]

২.৫ ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে যে,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ আল্লহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লহর রসূল।

এই সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে মানুষ তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে। একে বলা হয় কালিমাতুত তয়্যিবাহ বা, কালিমায়ে তায়্যিবাহ। কালিমা তয়্যিবাহ পাঠ করার মাধ্যমে ইসলামের পথে ব্যক্তি তার যাত্রা শুরু করে।

কালিমাটির রয়েছে দুটি অংশ যথা: লা ইলাহা ইল্লাল্লহ এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। সর্বপ্রথম, ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই। একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। আর যত সকল উপাস্য এই পৃথিবীতে আছে সবই বাতিল, মিথ্যা। তারা কেউই উপাসনার, উলুহিয়্যাতের যোগ্য নয়।

কালিমাটির দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লহ তা'আলার রসূল। আল্লহ তা’আলা এই পৃথিবীতে ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যে মানুষটির মাধ্যমে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা। তিনি ৪০ বছর বয়সে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কর্তৃক নবুওয়াত লাভ করেন। ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ:) তার নিকট আল্লহ তা'আলার বাণী নিয়ে আসেন। এই বাণী-ই কুরআনুল কারীম।

একজন মুসলমান এই বিশ্বাস রাখেন যে আল্লহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর মনোনীত রসূল যার ওপর আল্লহ তা'আলা তাঁর বাণী, কুরআনুল কারীম নাযিল করেন। রসূল ﷺ সর্বশেষ নবী ও রসূল, তাঁর ওপর নাযিল হওয়া বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এই বিধানের কিছু এসেছে কুরআনে এবং কিছু এসেছে রসূল ﷺ এর হাদীসে। একজন মুসলমান আল্লহ ও তাঁর রসূলের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে এবং এই বিশ্বাস রাখবে যে ইসলামী জীবন বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম।

قَالُوۡا سَمِعۡنَا وَ اَطَعۡنَا

অর্থঃ এবং তাঁরা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ সহকারে) শুনেছি এবং তা (খুশীমনে) পালন করছি। [সূরা আল বাকারা ২:২৮৫]

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামী জ্ঞানের উৎস

একজন মানুষ প্রাথমিকভাবে কোন কোন উৎস থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে তা-ই এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য যে উৎসগুলো অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় তার মাঝে প্রধান হচ্ছে কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে রসূল ﷺ। পাশাপাশি, কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সীরাত জানা অপরিহার্য।

৩.১ কুরআনুল কারীম

আরবী শব্দ قُرْآن এর অর্থ পঠিত। নিঃসন্দেহে কুরআনুল কারীম হলো রব্বুল আলামীন, আল্লহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত বাণী, যা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতস্বরূপ। নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সারা বিশ্বের অসংখ্য মুসলমান কুরআন পাঠ করেন।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কুরআন কারীমে-ই কুরআনের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

অর্থঃ এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই। এটা হিদায়াত ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য। [সূরাঃ আল-বাকারা ২:২]

এই আয়াতের ব্যাখায় মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. বলেন যে, এ কিতাবের প্রতিটি কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানব-রচিত কোনও গ্রন্থকে শত ভাগ সন্দেহমুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক তার জ্ঞানের একটা সীমা আছে। তাছাড়া তার রচনার ভিত্তি হয় তার ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার উপর। কিন্তু এ কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাআলার কিতাব, যার জ্ঞান সীমাহীন এবং শত ভাগ সন্দেহাতীত, তাই এতে কোনও রকম সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা তার বুঝের কমতির কারণেই দেখা দেবে, না হয় এ কিতাবের কোনও বিষয় সন্দেহপূর্ণ নয় আদৌ।

কুরআনুল কারীমে ১১৪টি সূরা রয়েছে। ৩০টি পারা ও ৬০টি হিযব রয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ, ৩০তম পারায় ৩৭টি সূরা রয়েছে। প্রতিটি সূরাতে রয়েছে পাঠকারীর জন্য হেদায়েত ও রহমত। পবিত্র এ কিতাব নাযিল হয়েছে পরবর্তী সমস্ত মানুষের জন্য,

قَدۡ جَآءَکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ نُوۡرٌ وَّ کِتٰبٌ مُّبِیۡنٌ ◑ یَّهۡدِیۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ یُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَ یَهۡدِیۡهِمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

অর্থঃ আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব এসেছে, যা (সত্যকে) সুস্পষ্ট করে। যার মাধ্যমে আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন। [সূরাঃ আল-মায়িদা ৫: ১৫-১৬]

কুরআনের আয়াতগুলো প্রধানত দুইধরনের - মুহকাম ও মুতাশাবিহ। যেমনটা কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেন -

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡکَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡکِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ‍ؔ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ‍ؔ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّکَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

অর্থঃ (হে রাসূল!) সে আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার উপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের তাবীল খোঁজা, অথচ সেসব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যাদের জ্ঞান পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তাআলার জানা)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:৭]

এ আয়াতের ব্যাখায় মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, এ আয়াতটি বুঝবার আগে একটা বাস্তবতা উপলব্ধি করে নেওয়া জরুরী। তা এই যে, এই জগতে এমন বহু বিষয় আছে যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তো এমন এক সত্য, যা প্রতিটি মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নয়। কেননা তা মানব বুদ্ধির বহু ঊর্ধ্বের বিষয়। কুরআন মাজীদ যেখানে আল্লাহ তাআলার সে সকল গুণের উল্লেখ করেছে, সেখানে তা দ্বারা তাঁর অপার শক্তি ও মহা প্রজ্ঞাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনও লোক যদি সে সকল গুণের হাকীকত ও সত্তাসারের দার্শনিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে তার হয়রানী ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। কেননা সে তার সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ তাআলার অসীম গুণাবলীর রহস্য আয়ত্ত করতে চাচ্ছে, যা

তার উপলব্ধির বহু ঊর্ধ্বের। উদাহরণত কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় ইরশাদ করেছে আল্লাহ তাআলার একটি আরশ আছে এবং তিনি সেই আরশে 'মুসতাবী' (সমাসীন) হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আরশ কেমন? আর তাতে তাঁর সমাসীন হওয়ার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এসব এমন প্রশ্ন, যার উত্তর মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরের জিনিস। তাছাড়া মানব জীবনের কোনও ব্যবহারিক মাসআলা এর উপর নির্ভরশীলও নয়। এ জাতীয় বিষয় যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মুতাশাবিহ' আয়াত বলে। এমনিভাবে, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে পৃথক পৃথক হরফ নাযিল করা হয়েছে (যেমন এ সূরারই শুরুতে আছে 'আলিফ-লাম-মীম') যাকে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তাআত' বলা হয়, তাও 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এ আয়াতে নির্দেশনা দিয়েছে যে, এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে না পড়ে বরং এর প্রতি ঈমান আনতে হবে, আর এর প্রকৃত মর্ম কী, তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বিপরীতে কুরআন মাজীদের অন্যান্য যে আয়াতসমূহ আছে তার মর্ম সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সে সকল আয়াতই মানুষের চলার পথ-নির্দেশ করে। এ রকম আয়াতকে 'মুহ্কাম' আয়াত বলে। একজন মুমিনের কর্তব্য বিশেষভাবে এ জাতীয় আয়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

তাফসীরে জাকারিয়াতে এসেছে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহর সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্র। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বললেন, "যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা এ সমস্ত (মুতাশাবিহ) আয়াতের পিছনে দৌড়াচ্ছে, তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ এ সমস্ত লোকের কথাই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তখন তাদের থেকে সাবধান থাকবে।" [বুখারী ৪৫৪৭; মুসলিম: ২৬৬৫]

আল্লহ তা'আলা স্বয়ং এই কুরআনের সত্যতা ঘোষণা করেছেন,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

অর্থঃ সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"। [সূরাঃ আল- ফুসসিলাত ৪১:৪২]

বেশি বেশি কুরআন পাঠে অন্তর আলোকিত হয়, প্রশান্ত হয়। কুরআন তার পাঠকারীর জন্য রহমতস্বরূপ। এমনকি অর্থ না বুঝে কুরআন পাঠ করাও অত্যন্ত ফায়েদাজনক। কিয়ামতের দিন এই কুরআন তার পক্ষে আল্লহর কাছে সুপারিশ করবে। অপরদিকে, কুরআন পাঠ না করলে সে তার বিপক্ষে সুপারিশ করবে।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ رواه مسلم

অর্থঃ সাহাবী আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে। [মুসলিম, ১৯১০]

হাদীসে নববী ﷺ-এ কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যে শেখে এবং যে শেখায় তাদের উভয়ের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থঃ উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী, ৫০২৭]

কুরআন নাযিল হয় মৌখিক বাণীরূপে। এই বাণী বা আয়াতগুলোকে রসূল ﷺ নিজে মুখস্থ করতেন এবং তাঁর সাহাবীগণকেও মুখস্থ করাতেন। সেই সময়ে কাগজের তেমন প্রচলন ছিলো না। তাঁরা লেখার মতো যা কিছু পেতেন, যেমন গাছের বাকল, পশুর চামড়া, গাছের ডাল, পাথর ইত্যাদি, তাতেই আয়াতগুলো লিখে নিতেন। এই সময়ে কুরআনকে যদিও মুসহাফ আকারে সংরক্ষণ করা হয়নি তবে, সাহাবায়ে কেরাম একে সংরক্ষণ করে নিয়েছিলেন তাঁদের সিনায় তথা অন্তরে।

রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (র:) রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নিয়ে লিখিত বিভিন্ন অংশগুলো একটি একত্র করেন। জীবরাইল (আ:) কর্তৃক আল্লহর রসূল

ﷺ এর নিকট কুরআনের আয়াতসমূহের যে ক্রমবিন্যাস বর্ণিত হয়, সাহাবায়ে কেরাম রসূল ﷺ এর থেকে যে ক্রম শিখে নিয়েছিলেন, সেই ক্রমই অনুসরণ করা হয়। আয়াতসূহের ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। প্রত্যেক সাহাবীকে বলা হয় তাঁর কাছে থাকা আয়াতের পক্ষে অন্তত দুজন সাক্ষী উপস্থিত করতে। এভাবে আয়াতগুলোকে একটির পর একটি বসিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হল। লিপিবদ্ধকরণের পর কুরআনের অনুলিপি সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ সভায় পাঠ করা হয়। এতে কারো কোনো আপত্তি দেখা দেয়নি। মোট ৩৩,০০০ সাহাবী একমত হয়েছিলেন যে, কুরআনের প্রতিটি বর্ণ পর্যন্ত সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৯] হযরত যাইদ ইবনু সাবিত (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - কুরআনের এ সংকলিত সহীফাগুলো আবু বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। অতঃপর আল্লহ তাকে ওফত দিলেন। পরে উমারের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। অতঃপর আল্লহ তাঁরও ওফাত দিলেন। এরপর হাফসাহ বিনতে উমার (র:) এর কাছে ছিল। [সহীহ বুখারী, ৭১৯১]

হযরত উমার (র:) এর পর খলিফা হলেন হযরত উসমান (র:)। তাঁর সময়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কুরআনের সহীফাগুলোকে একত্র করে মুসহাফ আকারে একত্র করা হয় এবং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক কপি করে মুসহাফ প্রেরণ করা হয় যেন আরব-অনারব সকলে একইভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে। এটি-ই উসমানী মুসহাফ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে পাঠকে সহজ করার জন্য ধীরে ধীরে এতে যুক্ত হয় নুকতা (হরফের উপরে/নিচে থাকা ছোট ছোট বিন্দুচিহ্ন) এবং হারকাহ (যবর, যের, পেশ, সাকিন, তাশদীদ)। কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে নুকতা ও হারকাহগুলো আজকের অবস্থায় আসে যার সাথে আমরা পরিচিত। তবে, কুরআনের হরফগুলো শুরুতে যা ছিলো এখনো তা-ই আছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা স্বয়ং এর সংরক্ষক,

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

অর্থঃ বস্তুত এ উপদেশ বাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা। [সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৯]

৩.২ হাদীসে রসূল ﷺ

আরবী শব্দ حَدِيث এর শাব্দিক অর্থ বাণী, সংবাদ, নতুন ইত্যাদি। পরিভাষায়, আল্লহর রসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর মুখ নিসৃত বাণী, কৃত কাজ ও অনুমোদন এবং তাঁর সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে হাদীস বলে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি (রহ:) বলেন,

علم الحديث هو علم يعرف به اقوال رسول الله ﷺ وافعاله واحواله

অর্থঃ ইলমে হাদীস এরূপ এক শাস্ত্রের নাম যা দ্বারা রসূল ﷺ এর বাণী, কর্ম ও হাল বা অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।[২০]

আল্লহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনে পাকে রসূল ﷺ কে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

অর্থঃ বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। [সূরাঃ আল-আহযাব ৩৩:২১]

এটা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লারই নির্দেশ যে, একজন মুসলমান আল্লহকে মানবে এবং তাঁর রসূলকেও মানবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বরবাদ করো না। [সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৩]

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُما كِتابَ الله وسُنَّتي

অর্থঃ আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। [হাকেম ৩১৯]

হাদীসে রসূল ﷺ শরীয়তের ২য় প্রধান উৎস। কুরআনে বহু হুকুম-আহকাম সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। সেই আহকামগুলোর বিস্তারিত এসেছে নবী ﷺ এর হাদীস থেকে। আল্লহ তা'আলার

নির্দেশে জিবরাইল (আ:) নবীজীকে শরীয়তের হুকুম-আহকামগুলো কিভাবে পালন করতে হয় তা শিখিয়েছেন এবং তিনি তাঁর সাহাবীগণকে শিখিয়েছেন। সাহাবীগণ তাঁদের পরবর্তীদেরকে শিখিয়েছেন। এভাবে ইসলামী হুকুম আহকামগুলো এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মের কাছে এসেছে। রাসুল (সা.) বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে (অথবা তিনি বলেন) উম্মতে মুহাম্মদীকে কখনো ভ্রষ্টতার ওপর একত্র করবেন না।" তিনি আরো বলেন, "আমার উম্মতের একদল লোক সব সময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (মুসলিম, ১৯২০)

কুরআনের মতো হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের কাছ থেকে ব্যাপক সতর্কতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

1. **কিতাবাত (الكتابة):** কোনো কিছু লিখে রাখা, writing down [লিসানুল আরাব ১/৬৮৯]

2. **তাদউইন (التدوين):** একত্রীকরণ, to assemble, to make by gathering things from various sources [লিসানুল আরাব ১৩/১৬৬]

3. **তাসনীফ (التصنيف):** বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অধ্যায় উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে রচনা করা [লিসানুল আরাব ৯/১৯৮]

প্রথম দিকে সাহাবায়ে কেরাম রসূল ﷺ এর অনুমতিক্রমে হাদীস লিখে রাখতেন। তবে ঐ সময়ে হাদীস মুখস্থ রাখারই অধিক প্রচলন ছিল। হাদীসের শিক্ষাগুলো সাহাবায়ে হাতে-কলমে শিখে নিতেন এবং আমলের মাধ্যমে তা আত্মস্থ করতেন। যে বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন সেগুলো লিখে নিতেন। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, একজন আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ এর কাছে আরজ করলেন,

"হে আল্লহর রসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না।"

নবী ﷺ বললেন, "তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।" তারপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইশারা করলেন। (তিরমিযী) এই সময়ে মূলত কিতাবাত তথা সাধারণভাবে লিখে রাখার উদ্যোগ গৃহীত হয়।

এরপর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথম হাদীস সংকলনের উদ্যোগ নেয়া হয় খলিফা উমার ইবনে আব্দুল আযীযের পৃষ্ঠপোষকতায়। তখন একদিকে, সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাবেয়ীগণ (সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম)-ও পরকালের পথে পাড়ি দিচ্ছিলেন। অপরদিকে, ইসলামের প্রসার ঘটছিল এবং কিছু ভ্রান্ত মতবাদ-ও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। খলিফা মদীনাসহ তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও আলেমগণের নিকট ফরমান জারী করেন যে - আপনারা আল্লহর রসূল ﷺ এর হাদীস তালাশ করে সংগ্রহ করুন। আমার আশংকা হচ্ছে যে, ওলামাদের (সাহাবী ও তাবেয়ীনদের) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাদীসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! মহানবী ﷺ এর হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। আর আপনার নিজ নিজ এলাকায় মজলিস প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস শিক্ষা দিতে থাকুন। কেননা জ্ঞান গোপন থাকলে একদিন তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ সময় ব্যাপক আকারে তাদউইন করা হয়। যারাই সাহাবী বা তাবেয়ীদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন, তারা এর পাশাপাশি সাহাবী ও তাবেয়ীনদের আছার তথা হাদীসের ব্যাখা, বিশ্লেষণ, হাদীসটি দ্বারা তিনি কি বুঝতেন এসব-ও লিখে নিয়েছেন। এতে শুধু হাদীসই নয়, কিভাবে ঐ হাদীসের ওপর আমল করতে হবে তা-ও জানা যায়।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তাসনীফের কাজ সম্পন্ন হয়। হাদীসকে তার সনদ অনুযায়ী যাচাই বাছাই করা হয় এবং সনদের মান অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর যেমন: সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মাওযু ইত্যাদি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। সনদ হচ্ছে কার থেকে কে ঐ হাদিসটি শুনেছেন তার ধারা বিবরণ। এক্ষেত্রে ইমামগণ অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দেন এবং সনদের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে খতিয়ে দেখেন যে লোকটি কেমন ছিলেন, তিনি বিশ্বস্ত কিনা, তাঁর স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য কিনা ইত্যাদি। রাবীগণের তথা, হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবন-চরিত পর্যালোচনা করে কোন হাদিসটি গ্রহণীয় আর কোনটি নয়, তা নির্ধারণ করা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনাকারী এ শাখাকে বলা হয় রিজাল শাস্ত্র। এ যুগেই সমস্ত হাদিস রাবীদের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়ে কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর এমন কোন হাদিস কারো কাছে আছে বলে অনুমান করা যায় না, যা কোনো না কোনো কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।[২০] এভাবে আল্লহর রহমতে বহু সংখ্যক মুসলমানদের প্রচেষ্টায় আল্লহর রসূল ﷺ এর হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

৩.৩ সীরাতে রাসূল ﷺ

আরবী শব্দ سيرة অর্থ পথ বা রাস্তা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোন ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে জানি, ততক্ষণ আমরা মূলত ওই ব্যক্তির জীবনপথেই পরিভ্রমণ করি। তিনি কেমন ছিলেন, কোথায় গিয়েছেন, কার সাথে মিশেছেন, কি বলেছেন, কি করেছেন, কোন পথে জীবন অতিবাহিত করেছেন ইত্যাদি বিষয় আমাদের সামনে এমনভাবে ফুটে ওঠে যেন আমরাও তা করছি, বলছি, এবং দেখছি। যেন ঐ পথে আমরাও তার সাথে চলছি। এজন্য কোনো ব্যক্তির জীবনীকে বলা হয় সীরাত। আর পরিভাষায় সীরাত হল রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী।

কুরআনুল কারীমে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

قُلۡ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ جَمِیۡعَۨا الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الَّذِیۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ کَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ

অর্থঃ (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যার আয়ত্তে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আন, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর। [সূরাঃ আল-আরফ ৭:১৫৮]

অন্যত্র আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَ اِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیۡمٍ

অর্থঃ এবং নিশ্চয়ই তুমি অধিষ্ঠিত আছ মহান চরিত্রে। [সূরাঃ আল ক্বলাম ৬৮:4]

এই আয়াতের ব্যাখায় 'মহৎ চরিত্র' এর অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ দ্বীন। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে ইসলাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো দ্বীন নেই। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, স্বয়ং কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর "মহৎ চরিত্র"। অর্থাৎ কুরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, "মহৎ চরিত্র" বলে কুরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কুরআন শিক্ষা দিয়েছে। [কুরতুবী]

মানব ইতিহাসে অসংখ্য নেতা দার্শনিক যোদ্ধা ও সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছেন তারা কেউ সবাই প্রভাব বিস্তার করেছেন কেউ যুগ পরিবর্তনের প্রয়াস করেছেন কিন্তু তাদের সবাই সময়ের প্রভাবে মিলিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে শুধু একজনের জীবন ও আদর্শ যুগের পর যুগ ধরে আজও আলোকবর্তিকা হয়ে আছে তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (ﷺ)।[২১]

আজ আল্লহর রসূল ﷺ দুনিয়াতে নেই, তাকে সরাসরি চাক্ষুস দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ইসলামকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ও মানতে হলে সীরাত জানার কোনো বিকল্প নেই। তাঁর মাধ্যমে আল্লহ তা'আলা আমাদের সামনে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন ইসলাম কী, কিভাবে হবে তাঁর বাস্তবায়ন। রসূল ﷺ এর প্রতিটি কথা, কাজ ও সিদ্ধান্ত মানবতার জন্য চিরমুক্তির পথ প্রদর্শক। সাহাবায়ে কেরাম (র:) তাদের সন্তানদেরকে সীরাত শেখাতেন যেমন কুরআনের সূরা শেখাতেন। ইমাম আল বায়হাকী (র:) বর্ণনা করেন -

كانوا يعلمون أولادهم مغازي رسول الله ﷺ، كما يعلمونهم السورة من القرآن

অর্থঃ তাঁরা তাঁদের সন্তানদের নবীজির জিহাদের বিষয় সমূহ শেখাতেন যেমন আল কুরআনের সূরা শেখাতেন।

সীরাতের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে একে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র হিসেবে আলোচনা করা হয়। এতে তার জীবনের বিবরণ - জন্ম থেকে শুরু করে ওফাত পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় - যেমন: তাঁর বংশ, শৈশব, নবুওয়াত, মু'জিযা, দাওয়াত, হিজরত, জিহাদ, গাজওয়া, ওফাত ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা, বুঝা, পড়া, শোনা ও আলোচনা করা হয়। রসূল ﷺ এর সীরাতকে মোটাদাগে তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়, যথাঃ

1.জন্মের পর থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভের আগ পর্যন্ত ঘটনাবলী

2.নবুওয়াত লাভের পর থেকে হিজরত পর্যন্ত ঘটনাবলী

3.হিজরতের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী

সীরাত অধ্যয়নের অনেক উপকারীতা রয়েছে। তার মাঝে অন্যতম হলো -

● নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন তা জানা যায় যা তাঁর অনুসরণে সহায়ক হয়।

● কুরআন সুন্নাহ বুঝতে সাহায্য করে, কোন প্রেক্ষাপটে, কোন পরিস্থিতিতে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা বুঝতে হলে অবশ্যই সীরাহ জানতে হবে।

● আমাদের আজকের জীবনে দ্বীনের অনেক বিষয় বুঝে আসে না বা কঠিন মনে হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা সীরাত জানি না।

● দাওয়াতের পর্যায়ক্রমিকতা ও তার কৌশল শিখতে সহায়ক হয়

● নবীর ধৈর্য ও বিজয়ের মুহূর্তে তার নম্রতা, সাহাবাদের সঙ্গে তাঁর আচরণ, শত্রুদের সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে কোন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমান হিসেবে কেমন হবে আমাদের আচরণ।

● ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিকভাবে মানুষ বিশেষত মুসলমানেরা আজ নানান সমস্যায় জর্জরিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। অথচ রসূল ﷺ এর সীরাত থেকে জানা যায় যে মুসলমান যদি দ্বীন ইসলাম যথাযথভাবে পালন করে তাহলে এর কোনোটিই থাকবে না। এর প্রমাণ আমরা পাই মুসলিম রাষ্ট্রে যার গোড়াপত্তন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর হাতে। সীরাত তাই আমাদের জন্য এক আলোকবর্তিকা

প্রকৃত মুসলমান হতে হলে আল্লহ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালোবাসতে হবে সবকিছুর চেয়ে বেশি। আর ভালোবাসা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা তাঁদের সম্পর্কে জানব। কুরআন, হাদীস ও সীরাতের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ইসলামী দ্বীন। আমাদেরকে তা অধ্যয়ন করতে হবে এবং নিজ জীবনে অনুশীলন করতে হবে সেভাবে, যেভাবে আল্লহ বলেছেন এবং যেভাবে আল্লহর রসূল ﷺ নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী বিশ্বাস

৪.১ ঈমানের পরিচয়

ঈমান (إيمان) শব্দটি আরবী মূলধাতু أمن থেকে নির্গত, যার শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা, বিশ্বাস করা, অবনত হওয়া, স্বীকৃতি দেয়া ইত্যাদি। আল্লহর নবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য বিষয়াবলি পেশ করেছেন এবং যা মেনে নেয়ার দাওয়াত প্রদান করেছেন, তা সত্য বলে মেনে নেওয়াই হলো ঈমান।[১০] إيمان থেকে ইসমে ফায়েলের সিগাহ হচ্ছে مُؤْمِن (মু'মিন)। যার মাঝে ঈমান থাকে তাকে বলা হয় মু'মিন।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ ... قَالَ :فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ .قَالَ» :أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ . «قَالَ صَدَقْتَ .رَوَاهُ مُسلم

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। ... অতঃপর লোকটি পুনরায় বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, ঈমান হল আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, রসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকদীর তথা ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ হতে হয় এ বিশ্বাস করা। লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন। (মুসলিম) [মিশকাতুল মাসাবীহ, ঈমানের অধ্যায়, হাদীস নংঃ ২] [৯]

উক্ত হাদীসের কিয়দাংশ ইতিপূর্বে ২.৪ এ ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছিলো। এবারে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়ার জন্য আমরা উক্ত হাদীসটির পরবর্তী অংশের দারস্থ হয়েছি, যেখানে জিবরীল (আ:) নবী করীম ﷺ এর নিকট জানতে চাইলেন যে, ঈমান কী। প্রশ্নকর্তা জিবরীল (আ:) হওয়ার কারণে এই হাদীসটি হাদীসে জিবরীল নামে প্রসিদ্ধ।

রসূল ﷺ এর উত্তর থেকে আমরা ৬টি বিষয় জানতে পারছি যার প্রত্যেকটিই বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দুনিয়ার জীবনে দেখা সম্ভব নয়, তাঁর

ফেরেশতাগণকে আমরা দেখি না। পূর্ববর্তী কিতাব ও নবী-রসূলগণকেও আমরা দেখিনি। সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত পরবর্তীগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে নি। পরকালীন পুরষ্কার - জান্নাত কিংবা পরকালীন শাস্তি - জাহান্নামও আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। তাকদীরের বিষয়টি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। না দেখা এই বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাস রাখাকেই পরিভাষায় ঈমান বলে। মু'মিন হওয়ার জন্য এই ৬টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে ঈমান রাখা জরুরী।

প্রকাশ থাকে যে, এই হাদীসে ঈমান ও ইসলামের যে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা কেবল এর শাব্দিক, পারিভাষিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে, ব্যবহারিক দিক থেকে নয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঈমান হচ্ছে অন্তরের কাজ অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরি, আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া। আর ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে বান্দার আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার, যা পূর্ণ করতে বাহ্যিক কাজ প্রয়োজন। যে সকল হাদিসে ঈমান ও ইসলাম পাশাপাশি এসেছে, সেখানে ঈমান ও ইসলামের তাত্ত্বিক দিকে বিবেচনায় রেখে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কিন্তু যেসব হাদিসে ঈমান ও ইসলাম আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উভয়টির ব্যবহারিক দিকই বিবেচিত হয়েছে। ব্যবহারের দিক থেকে যা ঈমান, তাই ইসলাম এবং যে ব্যক্তি মু'মিন, সেই মুসলিম।

সারকথা এই যে, কুরআন হাদিসের সাধারণ ব্যবহারে ঈমান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের সাথে কর্ম এবং ইসলাম দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম তথা কর্মের সাথে বিশ্বাস ও বোঝানো হয়। সুতরাং সাধারণ ব্যবহারে বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বিত রূপ - পূর্ণাঙ্গ ঈমান এবং কর্ম ও বিশ্বাসের সমন্বিত রূপ - পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[৯] সামনে আমরা ঈমানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করছি ইন শা আল্লহ।

৪.২ ইলাহ

لا إله إلا الله

অর্থ: আল্লহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই

যে কালিমার মাধ্যমে একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে তার প্রথম অংশ হচ্ছে এই স্বীকৃতি দেয়া যে এক আল্লহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই। একমাত্র তিনিই যাবতীয় ইবাদত, উপাসনার যোগ্য।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٤

অর্থঃ বলে দাও, আল্লাহ (সব দিক থেকে) এক। আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। এবং, তাঁর সমকক্ষ নয় কেউ। [সূরাঃ আল- ইখলাস ১১২: ১-৪]

সূরাতুল ইখলাস কুরআনুল কারীমের এমন একটি সূরা যার শব্দাবলী সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থ ব্যাপক। আর, এতে সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পরিচয়। তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআনে এসেছে, সূরাটি অবতরণের হেতু এই যে, একবার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লহ তা'আলার গুণাবলী ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই সূরা নাযিল করে তার জবাব দিয়েছেন। তিরমিযী, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লহ তা'লার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জবাবে এই সূরা নাযিল হয়।

এই সূরার প্রথম আয়াতে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে আল্লহ এক, অদ্বিতীয়। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, সকল দোষ-ত্রুটির সংশোধনকারী, গৌরবান্বিত, তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। এবং, তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, আকৃতিদাতা, সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক। [সূরাঃ আল- হাশর ৫৯: ২২-২৪]

এখানে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ‘আল-আসমাউল হুসনা’ (যার অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ) থেকে কতিপয় তুলে ধরা হয়েছে। আবু হুরায়রা (র:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলে পাক ﷺ কর্তৃক আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নিরানব্বইটি নাম বর্ণিত হয়েছে।[১১] এই নামগুলোকে একত্রে আল-আসমাউল হুসনা বলা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বোঝার সুবিধার্থে কেবল নামগুলোর বাংলা তরজমা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো প্রকৃত নাম নয়, প্রকৃত নাম তা-ই যা আরবী আয়াতে রয়েছে।[১২]

সূরাতুল ইখলাসের দ্বিতীয় আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি আল্লহ তিনি, যিনি الصمد। উক্ত আয়াতের ব্যাখায় মুফতী তাকি উসমানী দা.বা. তার তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনে বলেছেন যে, এটি এমন একটি শব্দ যার মর্ম কোনো এক-শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আরবীতে الصمد বলে তাকে, মানুষ নিজেদের বিপদ-আপদ ও সমস্যাবলীতে সাহায্যের জন্য যার শরণাপন্ন হয় এবং সকলে যার মুখাপেক্ষী থাকে, কিন্তু সে নিজে কারও মুখাপেক্ষী থাকে না। এখানে তাই আয়াতটির তরজমায় বিশেষ একটি শব্দ ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়ার সকল মাখলুক তাদের সকল চাহিদা, সকল চাওয়া-পাওয়ার জন্য আল্লহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তার বাড়ি দরকার, গাড়ি দরকার, খাবার দরকার, সে আল্লহর কাছে চাইবে। তার রোগ হলে সে আল্লহর কাছে সুস্থতা চাইবে, বিপদগ্রস্ত হলে সাহায্য চাইবে, ভুল করলে মাফ চাইবে, মনে অশান্তি থাকলে শান্তি চাইবে, ভালো কাজ করলে পুরষ্কারও তাঁর কাছেই চাইবে। কারণ তিনি ব্যতীত আর কেউ কিছু দেয়ার বা কোনো ধরনের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা রাখে না। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ, আল্লহ'র আশ্রয় ও শক্তি ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই।

মোটকথা, একজন মুসলিমের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবেন আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। তাকে সর্বাবস্থায় মাথায় রাখতে হবে যে, কোনো মাখলুকের কোনো সাধ্য বা ক্ষমতা নেই যে সে আল্লহ তা'আলার কোনো উপকার বা কাজ করে দিতে পারে। মানুষ যা করে, তার প্রতিফল তার নিজের-ই। আল্লহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির, মালিক এবং দাসের। আল্লহ তা'আলা কোনোভাবে কোনো কিছুর জন্যই তাঁর বান্দার মুখাপেক্ষী নন। যেমনটা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে পাকে বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَیۡهَا ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلۡعَبِیۡدِ
অর্থ: কেউ সৎকর্ম করলে তা নিজেরই কল্যাণার্থে করে আর কেউ অসৎ কাজ করলে, তার ক্ষতিও তার নিজেরই। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। [সূরাঃ ফুসসিলাত ৪১:৪৬]

পাশাপাশি, বান্দাকে মাথায় রাখতে হবে যে, সকল সম্পর্কের মাঝে ফার্স্ট প্রায়োরিটি তথা, প্রাধান্য পাবে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে বান্দার সম্পর্ক। অন্য কোনো সম্পর্ক - স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তানলর সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক, জাতি, ভাষা, গোত্র বা বর্ণগত সম্পর্ক - কোনোটিকেই এর উর্ধ্বে স্থান দেয়া যাবে না। যেমনটা হাদীসে পাকে এসেছে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ

অর্থ: আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো মাখলূকের আনুগত্য নেই।

তৃতীয় আয়াতটি যারা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলো এবং যারা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, তাঁর সন্তান-সন্ততি আছে বলে মনে করে (নাঊযুবিল্লাহ) তাদের জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা। না তাঁর কোনো শরীক আছে, আর না শরীকের প্রয়োজন আছে। অনুরূপভাবে, না তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি আছে, আর না প্রয়োজন আছে।

সন্তান-প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য - স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং, না তিনি কারো সন্তান আর না তাঁর কোনো সন্তান রয়েছে। আরবের কিছু মুশরিক মনে করত যে ফেরেশতাগণ আল্লহর সন্তান (নাঊযুবিল্লাহ)। অপর কিছু মুশরিক মনে করত যে যদিও আসমান-জমীন সবই আল্লহর সৃষ্টি তবে তাদের (মুশরিকদের) পূজ্য দেব-দেবীরা আল্লহকে তাঁর কাজে সাহায্য করে (নাঊযুবিল্লাহ)। আবার, ইহুদীগণ দাবীগণ করত যে হযরত উযায়ের (আ:) এবং খ্রিষ্টানগণের দাবী হযরত ঈসা (আ:) আল্লহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ)। এগুলো সবই তাদের ভ্রান্ত ধারণামাত্র। এ জাতীয় যাবতীয় শিরকমূলক কথা-বার্তা অবশ্যই বর্জনীয়। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِہٖ وَ یَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَ مَنۡ یُّشۡرِکۡ بِاللّٰہِ فَقَدِ افۡتَرٰۤی اِثۡمًا عَظِیۡمًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যে-কোন বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, সে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত হল। [সূরাঃ আন-নিসা ৪:৪৮]

চতুর্থ আয়াতে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নিজেকে একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কেউ বা কোনো কিছুই তার সমতুল্য নয়। আকার-আকৃতি কিংবা গুণ-প্রকৃতির দিক থেকে দ্বিতীয় কেউ নেই।

জাতের মাঝে জাতক এবং জাতকের মাঝে জাতের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। তাই এমনটা হতে পারে না যে, তাঁকে কেউ জন্ম দিয়েছে অথবা তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন। না তাঁর কাজে কেউ তাকে সহায়তা করতে পারে, আর না কারো সেই সক্ষমতা রয়েছে যে সাহায্য করবে। তিনিই সবাইকে দেন। সুবিশাল এই বিশ্বজগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনিই পরিচালনা করেন এবং এতে তাকে না ক্লান্তি স্পর্শ করে আর না নিদ্রা। সব দিক থেকেই

তিনি অনন্য, এক। এভাবে সূরার শেষ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর আলোচ্য বিষয়সমূহ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে।

আমরা মাখলুক, সৃষ্টি। আমাদের চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ। দৃশ্যমান এই জগতে আমরা আমাদের আসে-পাশে যা কিছু দেখি আমাদের চিন্তা, আমাদের কল্পনা তারই মাঝে সীমাবদ্ধ। এই সীমিত চিন্তাশক্তি দিয়ে যদি আমরা ভেবে বের করতে চাই যে আল্লহ কেমন, তিনি দেখতে কেমন ইত্যাদি তাহলে সেটা কোনোদিনও সম্ভব না। তাই আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই আয়াতে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কারোর বা কিছুর সাথেই তাঁর তুলনা চলে না, তার তুলনা কেবল তিনি নিজেই। আমাদের করণীয় হচ্ছে, তাঁরই ইবাদত করব এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাইব। তাহলে ইন শা আল্লহ আমরা সৎ পথ প্রাপ্ত হতে পারব।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا
অর্থঃ (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সাগর কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে সাহায্যরূপে অনুরূপ আরও সাগর নিয়ে আসি না কেন! [সূরাঃ আল কাহ্ফ ১৮:১০৯]

৪.৩ ফেরেশতাগণ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ
অর্থঃ রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে ঈমান এনেছে, যা তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। [সূরাঃ আল বাকারা ২:২৮৫]

আরবী শব্দ مَلَك এর বহুবচন مَلَائِكَة, যার অর্থ হল ফেরেশতাগণ। ফেরেশতাগণ আল্লহ তা’আলা মর্যাদাবান বান্দা। তারা এমন এক সৃষ্টি যারা সর্বদা আল্লহ তা'আলার ইবাদতে এবং হুকুম পালনে ব্যস্ত থাকেন। তারা খান না, ঘুমান না কিংবা ক্লান্ত হন না। তাদের জীবনের একটাই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আর তা হল, আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইবাদত করা এবং আদেশ বাস্তবায়ন করা। ফেরেশতাগণ নূর তথা আলোর তৈরী।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ. "

অর্থঃ মুহাম্মাদ ইবনে রাফি ও আব্দ ইবনে হুমায়দ (রাহঃ) .... আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। [সহীহ মুসলিম][১৪]

ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত। তারা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আদেশে বিভিন্ন কাজের আঞ্জাম দেন। কেউ শুধুই আল্লহর ইবাদত করেন (৭:২০৬, ৪১:৩৮), কেউ বার্তা বহন করেন (৩৫:১), কেউ জান্নাত ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন (৪০:৪৯), কেউ মানুষের আমলনামা লেখেন (৫০:১৭, ৮২:১০), কেউ মুসলমানদের হেফাজতের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন (১৩:১১), কেউ জান কবযের দায়িত্বে রয়েছেন (৬:৬১), কেউ মুসলমানদের জন্য রহমতের দুআ করেন (৪০:৭)। তারা সকলে দৃষ্টির আড়ালে থেকে আল্লহ তা'লার আদেশ পালন করেন। তবে আল্লহ তা'আলা আদেশে তারা বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারেন। বিভিন্ন সময়ে তারা নবী-রসূলদের কাছে অচেনা মেহমান হিসেবে এসেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিবরীল (আ:) বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে আসতেন। কখনো দিহইয়া কালবীর আকৃতিতে, কখনো গ্রাম্য লোকের আকৃতিতে, আবার কখনো তাঁর নিজ আকৃতিতেই আসতেন।[১৫]

সকলে ফেরেশতাগণের মাঝে প্রসিদ্ধ ফেরেশতাগণ হলেন:

1. জিবরাইল: তিনি বার্তা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই রসূল ﷺ এর কাছে কুরআনের বাণীসহ এসেছেন। (১৬:১০২)
2. ইসরাফিল: তিনি الصُّوْر তথা, শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন, যার সাথে সাথে কিয়ামতের সূচনা হবে। (৩৯:৬৮)
3. মিকাইল: তিনি গাছপালা, খাদ্য উৎপাদন , বৃষ্টি বর্ষণ ইত্যাদি দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।[১৬]
4. আজরাইল: তিনি জান কবয করার দায়িত্বে আছেন। তিনি মালাকুল মাউত নামেও পরিচিত। (৩২:১১)

5. মুনকার ও নাকীর: তারা উভয়ে কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন। (তিরমিজী, ১০৭১)
6. কিরমান কাতিবীন: তারা সেই ফেরেশতাগণ যারা মানুষের আমলনামা লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন। (৮২: ১১-১২)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা একজন মুসলিমের প্রতি অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে আল্লহ পাক বলেন,

مَنۡ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبۡرِيۡلَ وَ مِيۡكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلۡكٰفِرِيۡنَ

অর্থঃ যদি কোনও ব্যক্তি আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, তবে (সে শুনে রাখুক) আল্লাহ কাফিরদের শত্রু। [সূরাঃ আল বাকারা ২:৯৮]

৩.৪ কিতাবসমূহ

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ সম্বলিত বিভিন্ন কিতাব তাঁর নির্বাচিত রসূলগণের ওপর নাযিল করেছেন। এগুলো ‘আসমানী কিতাব’ বা, ‘কিতাব’ নামে সুপরিচিত। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে এগুলো যে আল্লহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত তাঁর কালাম, তা বিশ্বাস করা। এগুলোকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে এতে রয়েছে হিদায়াত এবং নূর। পাশাপাশি, পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে যে বিকৃতি ঘটছে তা-ও বিশ্বাস করা।

আসমানী কিতাবগুলো থেকে কয়েকটির নাম আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআন পাকে উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং ঐ কিতাবসমূহের প্রতিও যার নাম উল্লেখ করা হয়নি তবে কুরআন ও হাদীসে তাদের উল্লেখ রয়েছে। প্রসিদ্ধতম আসমানী কিতাবগুলো হল:

1. তাওরাত: আল্লহ তা'আলা বনী ইসরাইলদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত মূসা (আ:) এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেন। (৫:৪৪)

2. যবুর: আল্লহ তা'আলা বনী ইসরাইলদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত দাউদ (আ:) এর উপর যবুর কিতাব নাযিল করেন। (১৭:৫৫)

3. ইঞ্জিল: আল্লহ তা'আলা বনী ইসরাইলদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত ঈসা (আ:) এর উপর ইঞ্জিল কিতাব নাযিল করেন। (৫:৪৬)

4. কুরআন: আল্লহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর কুরআনুল কারীম নাযিল করেন। (২:১৮৫)

সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনুল কারীম ব্যতীত উপরোল্লিখিত অন্যান্য কিতাবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে এবং কিতাবগণ নিজেরাই তা করেছেন। যেমনটা কুরআনেই এসেছে,

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ

অর্থঃ ইয়াহুদীদের মধ্যে (কিছু লোক এমন আছে), যারা (তাওরাতের) শব্দাবলীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। [সূরাঃ আন নিসা ৪:৪৬]

আরেক স্থানে এসেছে,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ * ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

অর্থঃ সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, তারপর (মানুষকে) বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে কিঞ্চিত আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস। [সূরাঃ আল বাকারা ২:৭৯]

অতএব, আমরা বিশ্বাস রাখব যে, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল - এগুলো আল্লহ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাব। কিন্তু, বর্তমানে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল নামে যে কিতাবগুলো বিদ্যমান, তা সেই তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল নয়। আর, আমরা শুধু কুরআনের-ই অনুসরণ করব।

৪.৫ রসূলগণ

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

অর্থঃ তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন, (সত্যপন্থীদের জন্য) সুসংবাদদাতা ও (মিথ্যাশ্রয়ীদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। আর তাদের সাথে সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন, যাতে তা মানুষের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। [সূরাঃ আল বাকারা ২:২১৩]

নবী-রসূলগণ আল্লহ তা'আলার পক্ষ হতে মানবজাতির জন্য এক বিরাট নিয়ামতস্বরূপ। তারা আল্লহ তা'আলার প্রেরিত বাণীর ধারক হয়েছেন এবং বাহকরূপে তাদের কওমের মাঝে দ্বীনের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার হুকুম-আহকামকে হাতে-কলমে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তারা মানুষের শিক্ষক, তাদের পথপ্রদর্শক।

সাধারণভাবে, সকল রসূল একজন নবী-ও। কিন্তু, সকল নবী, রসূল নন। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, রসূল বলা হয় এমন পুরুষকে যার নিকট আল্লাহ তা'য়ালা ওহী প্রেরণ করেছেন, নতুন শরীয়ত পাঠিয়েছেন এবং তাকে সেটা প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন। আর নবী হলেন এমন পুরুষ যার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু তাকে নতুন কোনো বিধি-বিধান দেয়া হয়নি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রসূলের শরীয়ত অনুযায়ী মুমিন সম্প্রদায়কে পরিচালিত করেছেন।[১৭]

মুসলমানগণ এই বিশ্বাস রাখেন যে, নবী-রসূলগণ সকলেই আল্লহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাঁরা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও নিষ্পাপ ছিলেন। মানবীয় ভুল-ত্রুটি ছাড়া তাঁরা কখনো কোনো পাপে লিপ্ত হননি।[১৮] তারা মানবজাতির জন্য রূহানী চিকিৎসক। কুরআনুল কারীমে অনেক নবী-রসূলের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে, আবার অনেকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যেমনটা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা রসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ
অর্থঃ আর বহু রাসূল তো এমন, পূর্বে যাদের ঘটনাবলী আমি তোমাকে শুনিয়েছি এবং বহু রাসূল রয়েছে, যাদের ঘটনাবলী তোমাকে শুনাইনি। [সূরাঃ আন নিসা ৪:১৬৪]

রসূলগণ সম্পর্কে ঈমান আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো খতমে নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাস রাখা। তা এই যে, আল্লহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ

পাঠিয়েছিলেন, তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রসূল আসবেন না। কুরআনুল কারীমে আল্লহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَ لٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِيۡمًا

অর্থঃ (হে মুমিনগণ!) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। [সূরাঃ আল আহযাব ৩৩:৪০]

আর, হাদিসে পাকে রসূল ﷺ বলেছেন,

لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

অর্থঃ আমার পরে আর কোনো নবী নেই। (বুখারী ৪০৬৪, মুসলিম ৪৪১৮)

রসূলে পাক ﷺ এর আনীত দ্বীনই সর্বশেষ এবং এই শরীয়তকেই আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেছেন। (সূরা মায়িদা ৫:৩)

৪.৬ পরকাল

আখিরাত তথা পরকালের প্রতি বিশ্বাস, ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানুষ দুনিয়াতে জন্ম নেয়, জীবনভর এখানে অতিবাহিত করে, অতঃপর মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুর পর থেকে যে জীবন শুরু হয় তাকেই পরিভাষায় পরকাল বলা হয়। কুরআনুল কারীমে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

بَلۡ تُؤۡثِرُوۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا ◑ وَ الۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ وَّ اَبۡقٰى

অর্থঃ কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখেরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী। [সূরাঃ আল আ'লা ৮৭: ১৬-১৭]

আখিরাতের বেশ কিছু ধাপ রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো। এর প্রতিটিতে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

1. **মৃত্যু:** দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবনের মিলনবিন্দু হলো মৃত্যু। মৃত্যু অনিবার্য। তেমনি মৃত্যু যন্ত্রণাও অবধারিত। আল্লহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:১৮৫]

2. **কবর:** মৃত্যুর পর ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হবে তখন সেখানে সাওয়াল-জাওয়াব হবে। ২জন ফেরেশতা, মুনকার ও নাকীর। প্রত্যেক মানুষকে ৩টি প্রশ্ন করা হবে।

- তোমার রব কে?
- তোমার দ্বীন কী?
- তোমার নবী কে?

যারা দুনিয়ার জীবনে প্রকৃত মুসলমান ছিলেন, তারা আল্লহর রহমতে সঠিকভাবে জবাব দিতে পারবেন, যদিওবা, দুনিয়ায় তারা আরবী জানতেন না। কিন্তু যারা কাফের তারা যদি দুনিয়ার জীবনে এই প্রশ্নোত্তর মুখস্থ-ও করে নেয় তবুও কবরে তারা সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। অতঃপর যে সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে, তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। তখন তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধ হাওয়া বইতে থাকবে, তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে। আর যে সঠিকভাবে উত্তর দিতে অক্ষম হবে, তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। তখন তার দিকে জাহান্নামপর উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকবে, তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হবে। (সুনানে আবু দাউদ, ৪৭৫৩)

3. **পুনরুত্থান:** মৃত্যুর পর মানুষের বাহ্যিক দেহ পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লহ রব্বুল আলামীন পুনরায় তাকে জীবিত করবেন।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

অর্থঃ তিনি বললেন, সেখানেই (পৃথিবীতে) জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় (জীবিত করে) ওঠানো হবে।[আল আ'রাফ ৭;২৫]

4. **কিয়ামত:** ফেরেশতা হযরত ইসরাফিল যখন আল্লহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন, তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এর পূর্বে দুনিয়াতে কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পাবে। কিছু ছোট আলামত যেমন - নবী ﷺ এর নবুওয়াত লাভ ও তাঁর মৃত্যু, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়, নবুয়তের মিথ্যা দাবিদারদের আত্মপ্রকাশ, আমানতদারিতা না থাকা, ইলম উঠিয়ে নেয়া ও অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করা, সুদ, ব্যভিচার, ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপকতা, মানুষের আকৃতি রূপান্তর, ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। আর বড় আলামতসমূহের মধ্যে রয়েছে - পূর্ব দিকে ভূমিধস, পশ্চিম দিকে ভূমিধস, আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, আকাশ থেকে ধোঁয়া আসা, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াজুজ-মাজুজ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, এডেনের ভূগর্ভ থেকে আগুন বের হয়ে মানুষকে তাড়িয়ে নেওয়া, ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ। (সহীহ মুসলিম, ২২২৫)

5. **হাশর:** কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষকে পুনরায় উঠানো হবে তখন তারা সকলে হাশরের মাঠে সমবেত হবে। এখানে তার বিচার হবে। প্রত্যেকের সামনে তার আমলনামা উপস্থিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে সে কি কি করে এসেছে তার বৃতান্ত তার সামনে তুলে ধরা হবে। অতঃপর তার ভালো কাজ এবং খারাপ কাজগুলোকে মিযানের (মাপযন্ত্র) পাল্লায় ওজন দেয়া হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তার জন্য জান্নাতের এবং যার মন্দের পাল্লা ভারী হবে তার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা হবে।

6. **শাফাআত:** এর অর্থ সুপারিশ। কিয়ামতের দিন আল্লহ তা'আলা রসূল ﷺ কে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। বিচার কার্যক্রম শুরু করার জন্য, জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য, যারা বড় গুনাহ করেছে তাদের জন্য, জান্নাতীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি আল্লহর দরবারে শাফাআত করবেন। মুমিন ব্যক্তিরা, ফেরেশতাগণ এবং কুরআনুল কারীম নির্দিষ্ট কিছু শাফাআত করার অনুমতি লাভ করবেন।

7. **জান্নাত - জাহান্নাম:** মানুষের শেষ পরিণতি হবে এদুটির একটি - হয় অনন্ত সুখের জান্নাত, নতুবা চিরস্থায়ী শাস্তির জাহান্নাম। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনায় আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِیْهَاۤ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَیْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِیْنَ ۚ۬ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی ؕ وَ لَهُمْ فِیْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِی النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِیْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ

অর্থঃ মুত্তাকীদের যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তাতে আছে এমন পানির নহর, যা কখনও নষ্ট হওয়ার নয়, আছে এমন দুধের নহর, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তনীয়, আছে এমন সুরার নহর, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু, আছে এমন মধুর নহর যা থাকবে পরিশোধিত এবং তাতে তাদের জন্য থাকবে সব রকম ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত। তারা কি ওইসব লোকের মত হতে পারে, যারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করানো হবে উত্তপ্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে? [সূরাঃ মুহাম্মাদ ৪৭:১৫]

৪.৭ তাকদীর

....وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

ঈমান বিল কদ্বর তথা তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা এই যে, তাকদীর পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। অর্থাৎ, আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আগে থেকেই জানেন কার ভাগ্যে কি আছে। কে ভালো কাজ করবে এবং কে খারাপ কাজ করবে আর কার ভালো কাজ তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং কার খারাপ কাজ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে এ সবই তিনি জানেন। যেমনটা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা মূলকে বলেছেন,

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَہُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

অর্থঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত! [সূরাঃ আল মুল্‌ক ৬৭:১৪]

তাকদীরের বিষয়টা সহজে বোঝার জন্য আমরা উমার (র:) এর সময়কার একটি উদাহরণ নিই। একবার তিনি শাম অভিমুখে যাত্রা করছিলেন। তখন খবর এলো - ওখানে ভয়ংকর প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এ কথা শুনে তিনি সফরসঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং ফিরে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন তার সফরসঙ্গী একজন বললেন, "আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছেন?"
উমর (র:) বললেন, "আমরা আল্লহর এক তাকদীর থেকে আল্লহর অন্য তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি বলোতো তোমার কিছু উটকে যদি তুমি এমন কোনো উপত্যকায় নিয়ে যাও আর সেখানে আছে দুটি মাঠ - তন্মধ্যে একটি হলো সবুজ শ্যামল আর অন্যটি হলো শুষ্ক ও ধূসর। এবার বল ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ মাঠে চড়াও তাহলে তা আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী চড়িয়েছো আর যদি শুষ্ক মাঠে চড়াও তাহলে তা-ও আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী চড়িয়েছো।" (বুখারী ৫৭২৯, মুসলিম ২২১৯)

আমরা কি সবুজ মাঠ বেছে নিব? নাকি শুষ্ক মাঠ? আমরা আগে থেকে জানি না আমরা কোনটি করতে যাচ্ছি। হয়তো আমরা সবুজ মাঠ বেছে নিব, অথবা শুষ্ক মাঠ বেছে নিব। কেউ হয়তো তর্কের খাতিরে বলবে, আমি কোনোটিই বেছে নিব না। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে এমন যা সূরা মুলক উপরোক্ত আয়াতে এসেছে। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তো সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। তিনি আ'লিমুল গায়েব। তিনি আগে থেকেই জানেন আমরা কোনটি বেছ নিব - সবুজ মাঠ, শুষ্ক মাঠ নাকি অন্য কিছু। তাই সেটাকে লিখে রাখা তার জন্য কঠিন কিছু নয়। আমরা কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হব, আমাদের সামনে কি কি পথ থাকবে, সে অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত কী হবে - তা আল্লহ তা'আলা খুব ভালোভাবেই জানেন। আমরা ভালো অবস্থায় শোকর করব, নাকি অকৃতজ্ঞতা করব, বিপদের পরিস্থিতিতে সবর ও দুআ করব নাকি মুখ ফিরিয়ে নিব তা তিনি জানেন। এ সবকিছু তার-ই আয়ত্ত্বাধীন। তাই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা আল্লাহর এক তাকদীর থেকে আরেক তাকদীরের দিকে যাচ্ছি।

আরেকটি ঘটনা এমন যে, একবার এক লোক চুরি করে ধরা পড়ল। কেন চুরি করেছে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন, এটা তো আল্লাহর (লেখা) তাকদীরে ছিল।"
তখন উমার (র:) বললেন, "আর আমরা তোমাকে যে যেই শাস্তি দেব, তা-ও আল্লহর তাকদীর।"
তিনি আরো বলেন, "তুমি তাকদীরকে অজুহাত করছো, অথচ তুমি নিজের ইচ্ছায় চুরি করেছো।"[২২][২৩]

নি:সন্দেহে, এমন কোনো কাজ হয় না, যা সম্পর্কে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জ্ঞাত নন। আর, যা কিছু হয় তা আল্লহর ইচ্ছায় হয় কিন্তু এমন নয় যে তা আল্লহর হুকুমে হয়।[২৪] আল্লহ তা'আলা মালিক এবং খালিক তথা, সৃষ্টিকর্তা। পাপ কিংবা পূণ্য - মানুষের সকল কাজই আল্লহর সৃষ্টি, তিনি ইচ্ছা না করলে কিছুই হয় না।

وَ مَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰہُ ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا

অর্থঃ আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যাবৎ না আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরাঃ আল ইনসান ৭৬:৩০]

অপরদিকে, হুকুম অর্থ নির্দেশ। আর, আল্লহ তা'আলা কখনোই খারাপ বা মন্দ কাজের নির্দেশ দেন না।

قُلۡ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَاۡمُرُ بِالۡفَحۡشَآءِ ؕ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلَی اللّٰہِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

অর্থঃ তুমি (তাদেরকে) বল, আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না? [সূরা আল আ'রফ ৭:২৮]

ঈমান বিল কদর বা তাকদীরে বিশ্বাস বলতে নিম্নলিখিত ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করাকে বুঝায়[১৮]:

1. **আল্লহর অনাদী, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস:** মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টি তথা, মাখলুকের জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয় না। সৃষ্টির আগে থেকেই এই বিশ্বের সকল বিষয় - কোথায়, কিভাবে সংঘটিত হবে - তা সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই।

   وَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

   অর্থঃ আল্লহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। [সূরাঃ তাগাবুন ৬৪:১১]

2. **আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস:** মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লহ তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান কিতাবে মুবিন বা লাওহে মাহফুজ'এ লিখে রেখেছেন। যদিও লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না।

وَ عِنۡدَہٗ مَفَاتِحُ الۡغَیۡبِ لَا یَعۡلَمُہَاۤ اِلَّا ہُوَ ؕ وَ یَعۡلَمُ مَا فِی الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ ؕ وَ مَا تَسۡقُطُ مِنۡ وَّرَقَۃٍ اِلَّا یَعۡلَمُہَا وَ لَا حَبَّۃٍ فِیۡ ظُلُمٰتِ الۡاَرۡضِ وَ لَا رَطۡبٍ وَّ لَا یَابِسٍ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ مُّبِیۡنٍ

অর্থঃ আর তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবিসমূহ। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা-কিছু আছে, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। (কোনও গাছের) এমন কোনও পাতা ঝরে না, যে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন। মাটির অন্ধকারে কোনও শস্যদানা অথবা আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোনও জিনিস নেই যা এক উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। [সূরাঃ আল আনআ'ম ৬:৫৯]

3. **আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস:** এ মহাবিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয় তার সবই আল্লাহতালার ইচ্ছা ও তার জ্ঞানী হয় তার ইচ্ছা ও তার জ্ঞান এর বাইরে এ মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোন ঘটনাও ঘটে না।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

অর্থঃ আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন বস্তু তাকে ব্যর্থ করতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [সূরাঃ আল ফাতির ৩৫:৪৪]

4. **আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস:** মুমিন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ-ই বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া সবই সৃষ্ট তথা মাখলুক। মানুষের কর্ম-ও আল্লাহ সৃষ্টি করেন।

اَللّٰہُ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ ۫ وَّ ہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ وَّکِیۡلٌ

অর্থঃ আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছু রক্ষক। [সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৬২]

5. **মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস:** মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দেয়া হয়েছে যা দ্বারা সে আল্লহর আদেশ মানতে পারে, আবার ভঙ্গ করতে পারে। কুরআনে আল্লহ তা'আলা বলেন,

وَ ہَدَیۡنٰہُ النَّجۡدَیۡنِ

অর্থঃ আমি তাকে দু'টো পথই দেখিয়েছি। [সূরাঃ আল বালাদ ৯০:১০]

এই আয়াতের ব্যাখায় মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো ও মন্দ দুই পথই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, নিজ ইচ্ছায় চাইলে ভালো পথ অবলম্বন করতে পারে এবং চাইলে মন্দ পথেও যেতে পারে। তবে ভালো পথে চললে পুরস্কার পাবে আর মন্দ পথে চললে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

যেমন - মানুষ যদি নিজ ইচ্ছা শক্তি দ্বারা যাকাত আদায় না করে কিংবা চুরি করে তাহলে আল্লাহ তাকে জোর করে যাকাত আদায় করতে বাধ্য করে না বা চুরি করা আটকে দেন না। যদিও আল্লাহর এ ক্ষমতা আছে কিন্তু তিনি তা করেন না। বরং, সব কাজের জন্য তিনি একটি ফলাফল নির্ধারণ করেছেন এবং তা দেয়ার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করেছেন। যে কাজগুলোকে আল্লহ তা'আলা পূন্য তথা সওয়াবের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন সেগুলো যে করবে সে তার পুরস্কার পাবে এবং যে কেউ পাপের কাজগুলো করবে তার জন্য অনুরূপ শাস্তি থাকবে। কুরআনে এসেছে,

وَ اَنۡ لَّیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی

অর্থঃ আর মানুষ নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কিছুর (বিনিময় লাভের) হকদার হয় না। [সূরাঃ আন-নাজম ৫৩:৩৯]

আমরা সৃষ্টি, মাখলুক। সৃষ্টিজগতের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমরা দেখি, আমাদের নিয়ন্ত্রণে কেবল সেটুকুই আছে যেটুকু আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। এর বাইরে না কিছু আমরা দেখি, আর না কিছু আমরা বুঝি। আমরা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সুবিশাল কর্মপরিকল্পনার একটা অংশ মাত্র। তাই আমাদের করণীয় হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লহর ওপর তাওয়াক্কুল করা। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ভালো দিকটি বেছে নেয়া এবং খারাপ দিকটি পরিহার করা। এ বিষয়টা মনে রাখা যে, আল্লহ যা কিছু দেন তা-ই আমার জন্য কল্যাণকর আর আর যেটা দেননি সেটা আমার জন্য কল্যাণকর নয়, তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। তাঁর দেয়া সিদ্ধান্তই সর্বোত্তম এবং তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।

৪.৮ ইসলাম বনাম নাস্তিকতা

দুইজন শিশু, একজনের মা-বাবা আছে, আরেকজন ইয়াতীম। এই দুজন কি কখনো এক হতে পারে? ইয়াতীম শিশুটির চিন্তা-ভাবনা এবং বেড়ে ওঠার পরিবেশ আর মা-বাবাওয়ালা শিশুটির চিন্তা-ভাবনা এবং বেড়ে ওঠার পরিবেশ কখনো এক হবে না। ইয়াতীম শিশুটিকে ইয়াতীম হওয়ার কারণে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অনেক বৈরিতার সম্মুখীন হতে হয়, যা মা-বাবা থাকায় অপর শিশুটিকে ভোগ করতে হয় না।

ঠিক একইভাবে, নাস্তিক এবং মুসলিম কখনো এক হয় না। কারণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য - সবই ভিন্ন হয়। আল্লহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوۡلَی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ اَنَّ الۡكٰفِرِیۡنَ لَا مَوۡلٰی لَهُمۡ

অর্থঃ তা এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।[সূরাঃ মুহাম্মদ ৪৭:১১]

ইংরেজি Atheism শব্দটির বাংলা করা হয় নাস্তিকতা বা, নাস্তিক্যবাদ। এটি এমন একটি দর্শন বা চিন্তাধারা যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। নাস্তিক্যবাদ কোনো বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রচলিত সকল ধর্মবিশ্বাসকে তারা ভ্রান্ত আখ্যায়িত করে। সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়। বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না।[২৫] সকল নাস্তিকদের মাঝে মিল কেবল এটাই যে তারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, এছাড়া কোনো বিধি-বিধান তাদের নেই।

নাস্তিক হওয়ার সাধারণ কারণগুলো হলো ধর্ম সম্পর্কে ভুল ধারণা, খারাপ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, তথাকথিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, অহংকারবোধ, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি। মূলত, পশ্চিমা বিশ্বে নাস্তিকতার উত্থান হয় চার্চের নির্যাতন, বিজ্ঞানকে ধর্মের বিকল্প মনে করা, ডারউইনিজম, ধর্ম সম্পর্কে অপপ্রচার এবং বিশ্বনেতাদের সেকুলার মনভাবকে কেন্দ্র করে।

নাস্তিক তার জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্পর্কে অনবগত থাকে। জীবনের কোন অর্থ তার থাকে না, মৃত্যুকে-ই সে জীবনের শেষ পরিণতি হিসেবে মনে করে। যেহেতু আখিরাতের জবাবদিহিতার কোনো চিন্তা তার মধ্যে থাকে না, তাই সে নিজ দুনিয়াবী শক্তিমত্তা অনুযায়ী ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়। নাস্তিকের জীবন হয় দুনিয়া কেন্দ্রিক।

অপরদিকে, কুরআনে আল্লহ তা'আলা বলেন,

وَ مَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَ الۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ

অর্থঃ আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার এবাদত করবে।[সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৫৬]

আল্লহর পরিচয় নাস্তিক জানে না। মানুষ হিসেবে নিজ দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে-ও সে অনবগত। ফলে তার কর্মকান্ড হয় স্বৈরাচারী। নিজের অধিকার আদায়ে সে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে কিন্তু অন্যের অধিকার বিষয়ে সে চিন্তা করতে নারাজ। সে নিজের মতো করে ভালো-মন্দের মাপকাঠি সাজায়। আল্লহ মানুষকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাকে সৃষ্টির সেরা জীব - আশরাফুল মাখলুকাত - এর উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অথচ একজন নাস্তিক নিজেকে পশুর কাতারে মনে করে, পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে সে উন্নত পশু!

কুরআনুল কারীমে আল্লহ তা'আলা প্রশ্ন রেখেছেন,

اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَیۡرِ شَیۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ

অর্থঃ তারা কি কারও ছাড়া আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা?[সূরাঃ আত-তূর ৫২:৩৫]

তিনি আরো বলেছেন,

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۚۙ ◑ الَّذِیۡنَ یَذۡکُرُوۡنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰی جُنُوۡبِهِمۡ وَیَتَفَکَّرُوۡنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল বুদ্ধিমানদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি (এমন ফজুল কাজ থেকে) পবিত্র। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩: ১৯০-১৯১]

অপরদিকে, নাস্তিক মনে করে এই বিশ্বসহ সবকিছু আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। সে মনে করে বিজ্ঞানই সবকিছুর মূল আর যখন বিজ্ঞান কোনো কিছুর ব্যাখা দিতে অপরাগ হয়, তখন সে বলে প্রকৃতি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। কিন্তু সে চিন্তা করে না যে সত্যিই যদি প্রকৃতি তার খেয়াল-খুশি মতো সবকিছু করত তাহলে এই প্রকৃতির মাঝে এত সুনিপুণ নিয়ম-নীতি, এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা কিভাবে এলো! কার হুকুমে সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়, আবার পূর্ব দিক থেকে ওঠে। কেন কালকের সূর্যটা পশ্চিম থেকে ওঠে না! জোয়ার হয়, আবার ভাটা হয়। কিন্তু জোয়ারের পর আবার জোয়ার হয় না কেন! চাঁদটা কেন রাতেই ওঠে, তার কি একটু ইচ্ছা হয় না যে কাল সূর্যের পরিবর্তে সকালবেলা আমিই উঠি? এসব কিছু চিন্তা করলে বুঝে

আসে নিশ্চয়ই এমন কেউ একজন আছেন, যার হুকুমে এই সব কিছু হয়। সূর্য পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায় এবং পরদিন আবার পূর্ব দিক থেকেই ওঠে। চাঁদ রাতের বেলাতেই আলো দেয়, জোয়ারের পর ভাটা, তারপর আবার জোয়ার হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আ:) এর ঘটনাটি না উল্লেখ করলেই নয়।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ الَّيۡلُ رَاٰ كَوۡكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الۡاٰفِلِيۡنَ ◑ فَلَمَّا رَاَ الۡقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَٮِٕنۡ لَّمۡ يَهۡدِنِىۡ رَبِّىۡ لَاَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡقَوۡمِ الضَّآلِّيۡنَ ◑ فَلَمَّا رَاَ الشَّمۡسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ هٰذَاۤ اَكۡبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتۡ قَالَ يٰقَوۡمِ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُوۡنَ ◑ اِنِّىۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِىَ لِلَّذِىۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ حَنِيۡفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ

অর্থঃ সুতরাং যখন তার উপর রাত ছেয়ে গেল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখে বলল, ‘এই আমার প্রতিপালক’। অতঃপর সেটি যখন ডুবে গেল, সে বলল, যা কিছু ডুবে যায় আমি তা পছন্দ করি না। অতঃপর যখন সে চাঁদকে উজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, ‘এই আমার রব্ব’। কিন্তু যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন বলতে লাগল, আমার রব্ব আমাকে হিদায়াত না দিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাব। তারপর যখন সে সূর্যকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, এই আমার রব্ব। এটি বেশি বড়। তারপর যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা যে সকল জিনিসকে (আল্লাহর সঙ্গে) শরীক কর, তাদের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। [সূরাঃ আল আনআম ৬: ৭৬-৭৯]

এভাবে ইবরাহীম (আ:) সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে এমন কেউ অবশ্যই আছেন যিনি এই বিশ্বজগতকে সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণে বেঁধে রেখেছেন আর নিশ্চয়ই তিনিই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যে নিজে স্থির নয়, সর্বাবস্থায় বিরাজমান নয়, সে কিছুতেই স্রষ্টা হতে পারে না। প্রকৃত রব তো তিনিই যিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ চলে না, বরং সব কিছু তাঁর-ই নিয়মে চলে।

নিচের ছকে ইসলাম ও নাস্তিকতার মাঝে তুলনামূলক আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

বিষয়	নাস্তিকতা	ইসলাম

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি, কোনো কিছু ছিলো না, সেখান থেকে এমনিই সব কিছু হয়েছে	সবকিছুর সৃষ্টির একটা সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। আল্লহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য আর বাকি সব সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য
জীবনের উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যহীন জীবন, কেবল বেঁচে থাকাই মুখ্য	আল্লহর ইবাদত করা, দুনিয়াতে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা
ভালো-মন্দ নির্ধারণ	নীতি-নৈতিকতা মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ফলে তা ব্যক্তি ও সমাজভেদে পরিবর্তিত হয়। সকলের কল্যাণকামিতা নয় বরং দুনিয়ার দৃষ্টিতে শক্তিশালী ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়	ভালো-মন্দ আল্লহ ও তাঁর রসূল কর্তৃক প্রণোদিত, তাই এতে সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, কারো প্রতি জুলুম করা হয় না।
জবাবদিহিতা	ভালো-মন্দের চূড়ান্ত কোনো পরিণতি নেই, তাই জবাবদিহি তার কোনো পরওয়া নেই, ফলে সমাজের নৈতিক অবস্থার অবনতি হয়	মানুষ ভালো-মন্দ যা-ই করবে আখিরতে তার জন্য আল্লহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে - এই বিশ্বাস তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে
জীবনদর্শন	ভোগবাদী, দুনিয়ার জীবনই মুখ্য	ভারসাম্যপূর্ণ - দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবন বিবেচিত হয়
মানুষের মূল্যায়ন	মানুষ কেবলই একটি উন্নত পশু মাত্র	আল্লহ মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন
অন্তরের প্রশান্তি	উদ্দেশ্যহীন জীবনে স্থায়ী শান্তি অনুপস্থিত, ফলে অধিকাংশ নাস্তিকই অস্তিত্ব সংকট, হতাশা (ডিপ্রেশন), আত্মহত্যা প্রবণতা ইত্যাদি সমস্যায় ভোগে	নিশ্চয়ই আল্লহর স্মরণে অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে সর্বশক্তিমান আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার সাথে আছেন - এই বিশ্বাস তাকে মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করে

জীবনের ফলাফল	নাস্তিক ব্যক্তির দৃষ্টিতে মৃত্যু-ই তার জীবনের শেষ পরিণতি, দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে আর তার সম্পৃক্ততা থাকে না। আর, ইসলামের দৃষ্টিতে নাস্তিকের শেষ পরিণতি হল জাহান্নাম	ইসলামে মুসলিমের চূড়ান্ত পরিণতি হলো অনন্ত সুখের জান্নাত যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে আর, যেহেতু একজন মুসলিম দুনিয়ায় এক ইনসাফ ও ইহসানময় জীবন কাটানোর চেষ্টায় রত থাকে, ফলে দুনিয়ার জীবনেও আল্লহ তাকে মানুষের কাছে সম্মানিত করেন

অতএব, এ আলোচনা থেকে সাধারণভাবে চিন্তা করলেও একথা স্পষ্ট হয় যে ইসলাম গ্রহণ ও তদানুসারে জীবনযাপন করা নাস্তিক হওয়ার চেয়ে হাজার গুণ ভালো ফলাফল নিয়ে আসে।

পঞ্চম অধ্যায়: ইসলামে ইবাদত

৫.১ পবিত্রতা

আরবী শব্দ الطَّهَارَةُ এর বাংলা হচ্ছে পবিত্রতা। শরীয়াতের পরিভাষায়, শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় ইবাদতে প্রতিবন্ধক হদস এবং নাজাসাত থেকে পানি বা মাটির মাধ্যমে পবিত্র হওয়াকে তাহারাত বলে। আল্লহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيۡنَ وَيُحِبُّ الۡمُتَطَهِّرِيۡنَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর দিকে বেশি বেশি রুজু করে এবং ভালোবাসেন তাদেরকে, যারা বেশি বেশি পাক-পবিত্র থাকে। [সূরাঃ আল বাকারা ২:২২২]

হাদীসে এসেছে,

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ

অর্থঃ পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক (মুসলিম, ২২৩)

ইবাদতের পূর্ব শর্ত হলো তাহারাত। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

অর্থঃ আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করেন না। (সহিহ ইবনে মাজাহ, ২২৩)

তাহারাত প্রধানত দুই প্রকার[২৬], যথাঃ

1. **আত্মিক তাহারাত:** আত্মিক তাহারাত হলো শিরক পাপাচার ও যা কিছু অন্তরকে কলুষিত করে তা থেকে পবিত্রতা। অন্তরে শিরকের উপস্থিতি বজায় রেখে কখনো তাহারাত তর্জন করা যায় না। আল্লহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡمُشۡرِكُوۡنَ نَجَسٌ فَلَا يَقۡرَبُوا الۡمَسۡجِدَ الۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هٰذَا

অর্থঃ হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো আপাদমস্তক অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসে [সূরাঃ আত তাওবাহ্ - আয়াত নংঃ 28]

আয়াতটির তাফসীরে এসেছে এখানে মুশরিকদের বিশ্বাসগত অপবিত্রতা বোঝানো উদ্দেশ্য, যা তাদের সত্তায় বিস্তার লাভ করেছে।

2. **শারীরিক তাহারাত:** শরীর, পোষাক-পরিচ্ছদ, নামাজের স্থান ইত্যাদি থেকে নাপাকী দূরীকরণের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন হলো শারীরিক তাহারাত। একে মোটা দাগে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:

   a. **বিধানগত নাপাকী থেকে তাহারাত**

      i. **ওযুর মাধ্যমে:** মল-মূত্র ত্যাগ, মুখ ভরে বমি করা, বায়ু ত্যাগ, রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়া ইত্যাদি কারণে তাহারাত অর্জনের জন্য ওযু আবশ্যক হয়

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قُمۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغۡسِلُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ وَاَيۡدِيَكُمۡ اِلَى الۡمَرَافِقِ وَامۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ اِلَى الۡكَعۡبَيۡنِ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে তখন নিজেদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাত ধুয়ে নিবে, নিজেদের মাথাসমূহ মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পা (-ও ধুয়ে নেবে)। [সূরাঃ আল মায়িদাহ - আয়াত নংঃ 6]

      ii. **গোসলের মাধ্যমে:** কয়েক অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের কেবল ওযু যথেষ্ট হয় না, বরং গোসল করা প্রয়োজন। যেমন - সহবাস, ঋতুস্রাব, কাফের থেকে মুসলমান হওয়া ইত্যাদি

وَاِنۡ كُنۡتُمۡ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوۡا

অর্থঃ তোমরা যদি জানাবত অবস্থায় থাক তবে নিজেদের দেহ (গোসলের মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্র করে নেবে। [সূরাঃ আল মায়িদাহ - আয়াত নংঃ 6]

b. **প্রকাশ্য নাপাকী থেকে তাহারাত:** প্রকাশ্য নাপাকী হলো যেকোনো ধরনের মল, মূত্র, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি। এগুলো কাপড়ে বা শরীরে লাগলে সে স্থান ৩ বার ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি নাপাকী শক্ত হয় সেক্ষেত্রে প্রথমে উক্ত নাপাকী সম্পূর্ণভাবে অপসরণ করতে হবে, তারপর ৩ বার ধুতে হবে।

পবিত্রতা অর্জনের দ্বারা -

- শরীর সুস্থ থাকে
- মন ভালো থাকে
- রোগ থেকে নিরাপত্তা দেয়
- ইবাদত করার সক্ষমতা অর্জিত হয়
- সমাজের পাক-সাফ ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা অধিক
- আল্লহ পবিত্র ব্যক্তিকে পছন্দ করেন

আমরা যদি হাদীসের কিতাবে অনুসন্ধান করতে যাই তাহলে দেখি তাতে ঈমানের আলোচনার পরপরই তাহারাতের আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম ঈমানের পর তাহারাতের আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মিশকাত শরীফে ঈমান এবং ইলমের পরই তাহারাতের আলোচনা করা হয়েছে ইত্যাদি। পাক-সাফ থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়, গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এবং জান্নাতের পথ সুগম হয়।

৫.২ নামায

নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। আরবী শব্দ الصلاة এর অর্থ দোয়া করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা, রহমত ইত্যাদি। পরিভাষায়, কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত যা রুকু-সিজদা সহকারে নির্ধারিত শর্তাবলীর সহীত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত: সালামের মাধ্যমে শেষ হয়, তাকে সালাত বলে। (আল ফিকহুল মুয়াসসার, ৯৯)

নামাজ (نماز) হচ্ছে সালাতের ফার্সী প্রতিশব্দ যা বাংলায় অধিক প্রচলিত। ইসলামের বিধান এই যে প্রত্যেক বালেগ, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলিম নর-নারীর উপর দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ

ফরয। ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দেয়া ব্যক্তি ফিকহে হানাফী অনুযায়ী ফাসেক এবং নামাজ অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের।

কুরআনে ১৮ স্থানে সালাত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।[২৭] সূরাতুল বাকারার শুরুতে মুত্তাকীদের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে -

الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُم يُنۡفِقُوۡنَ ۙ
অর্থঃ যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। [সূরাঃ আল বাকারা ২:৩]

নামাজ ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। এটি আল্লহ ও বান্দার মাঝে সরাসরি সংযোগ সৃষ্টি করে। একে মুমিনের মিরাজ বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাড়ায় তখন সে আল্লাহর সঙ্গে একান্তে কথা বলে, যতক্ষণ সে তার জায়নামাযে থাকে। (সহীহ বুখারী, ৪২৬)[২৮]

দিনে ও রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাজ রয়েছে - ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। দৈনিক মোট ১৭ রাকাআত নামাজ ফরজ। এর বাইরে কিছু ওয়াজিব ও সুন্নত নামাজ রয়েছে। নামাজের নিষিদ্ধ কিছু সময় ব্যতীত অন্য যেকোনো সময় যত ইচ্ছা নফল নামাজ পড়ার সুযোগ রয়েছে। নামাজ পড়ার জন্য শর্ত হল গোসল ফরজ না হওয়া, ওযু থাকা, কাপড় ও নামাজের স্থান পাক থাকা, কিবলামুখী হওয়া এবং ওয়াক্তিয়া নামাজের জন্য ঐ ওয়াক্ত চলমান থাকা। ওয়াক্ত যদি শেষ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ঐ নামাজের কাযা আদায় করতে হবে।

নামাজ পড়া সরাসরি আল্লহর নির্দেশ। কুরআনের অধিকাংশ সূরাতেই নামাজের তাকিদ দেয়া হয়েছে।

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ
অর্থঃ এবং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও রুকূ‘কারীদের সাথে রুকূ‘ কর। [সূরাঃ আল বাকারা ২:৪৩]

নামাজ মুসলমানের নিদর্শন। রসূল ﷺ বলেন,
بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থঃ ব্যক্তি এবং শিরক কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ছেড়ে দেয়া (মুসলিম)

সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা। আল্লাহ বলেন,

أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ

অর্থঃ স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। [সূরাঃ আর-রা'দ ১৩:২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই হলো আল্লাহর যিকির। বরং, সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ

অর্থঃ আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর। [সূরাঃ ত্বাহা ২০:১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। নবী ﷺ বিলাল (র:)-কে বলতেন, "উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।" (মুসনাদে আহমাদ) বিলাল (র:) হলেন প্রথম ইমাম। নবীজী তাকে আযান দেয়ার জন্য উঠতে বলছিলেন যেন তারা এরপর নামাজ পড়তে পারেন।

পক্ষান্তরে, সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ। আর, আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ

অর্থঃ যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" [সূরাঃ ত্বাহা ২০:১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাই যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।[২৯]

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার কাছ থেকে নামাজের হিসাব নেয়া হবে। আবূ হুরায়রা (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে,কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে

সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত। (ইবনু মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬, তিরমিজী, ৪১৩)

নামাজ মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে। কুরআন কারীমে আল্লহ বলেন,

أُتْلُ مَآ أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থঃ (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। [সূরাঃ আল আনকাবুত ২৯:৪৫]

নামাজ বান্দাকে আল্লহর নিকটবর্তী করে। আল্লহর কাছ থেকে রহমত, বরকত ও সাহায্য পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে নামাজ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। [সূরাঃ আল বাকারা ২:১৫৩]

নামাজের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ হয়।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ◑ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

অর্থঃ নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। [সূরাঃ আল মু'মিনূন ২৩: ১-২]

৫.৩ যাকাত

যাকাত শব্দটি আরবী শব্দ الزَّكَاة থেকে গৃহীত, যার অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি ইত্যাদি। এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন। কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে 'যাকাত'-কে 'সাদাকাহ' (صدقة) নামে অভিহিত করা হয়েছে। অধিকাংশ আয়াতে যেখানে 'সালাত'-এর উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে 'যাকাত'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে।

যাকাতের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম কুসতলানী (রহ:) বলেন - নির্দিষ্ট পন্থায় কোন মাল থেকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে কোন কিছু বের হওয়াকে যাকাত বলে। যাকাত মালকে পবিত্র

করে, বিভিন্ন ক্ষতি ও কৃপণতা থেকে মানুষকে হিফাজত করে। যাকাত ইসলামের পাঁচ রুকনের মধ্যে হতে একটি। আর, যাকাত অস্বীকারকারী কাফের।

আল্লামা জুরজানী (রহ:) বলেন - যাকাত হল নির্দিষ্ট কোনো সম্পদের একটি অংশকে নির্দিষ্ট কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়া।

যাকাত প্রত্যেক ঐ মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ যে বালেগ, বিবেকবান এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। নিসাব হচ্ছে ঐ পরিমাণ সম্পদ যা থাকলে একজন মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ হয়। সাধারণভাবে, তা হল সম্পদের ৪০ ভাগের মাত্র ১ ভাগ বা, মোট সম্পদের মালিক ২.৫ শতাংশ। সুনির্দিষ্টভাবে -

- স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ
- রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে ৫২ তোলা রূপা
- আর মিলিত সম্পদ হলে এর সমপরিমাণ অর্থমূল্য আর অন্যান্য অর্থ মিলিয়ে যদি রূপার নিসাবের অর্থমূল্যের সমান হয়
- মিলিত সম্পদ হচ্ছে সোনা ও রূপা, সোনা ও অর্থ, রূপা ও অর্থ অথবা সোনা, রূপা ও অর্থ - এর প্রতিটিই কিছু পরিমাণে থাকা
- এক্ষেত্রে সম্পদের ওপর পূর্ণ একবছর অতিবাহিত হতে হবে। তবে যদি এমন হয় যে বছরের শুরুতে এবং শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ ছিলো কিন্তু মাঝে ছিলো না, সেক্ষেত্রেও যাকাত আসবে।
- ব্যক্তিগতভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে বছরের হিসাব আলাদা হতে পারে, যাকাত বছরের যেকোনো দিনই প্রদান করা যাবে

আর, কিছু সম্পদ আছে যাতে বছর পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন:

- মাটি থেকে উৎপন্ন ফল ও ফসল - এক্ষেত্রে যে সময় ফসল কাটা হবে তখনই যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় তো যাকাত দিতে হবে। আল্লহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّعۡرُوۡشٰتٍ وَّغَيۡرَ مَعۡرُوۡشٰتٍ وَّالنَّخۡلَ وَالزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيۡتُوۡنَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيۡرَ مُتَشَابِهٍ‌ ؕ كُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَاٰتُوۡا حَقَّهٗ يَوۡمَ حَصَادِهٖ

অর্থঃ আল্লাহ তিনি, যিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, (যার মধ্যে) কতক (লতাযুক্ত, যা) মাচা আশ্রিত এবং কতক মাচা আশ্রিত নয়। এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, যায়তুন ও আনার (সৃষ্টি করেছেন) যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সাদৃশ্যবিহীনও। যখন এসব গাছ ফল দেয় তখন তার ফল থেকে খাবে এবং ফল কাটার দিন আল্লাহর হক আদায় করবে [সূরাঃ আল আনআম ৬:১৪১]

- গবাদি পশু - রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে পশু পালনকারীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে বলেন নি।[৩২]

যাকাতের সম্পদ কাদেরকে দেয়া যাবে তা কুরআনে এসেছে। আল্লহ বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡعٰمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَالۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَفِى الرِّقَابِ وَالۡغٰرِمِيۡنَ وَفِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ‌ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ‌ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ

অর্থঃ প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও মিসকীনদের হক এবং সেই সকল কর্মচারীদের, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের। তাছাড়া দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধে এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের সাহায্যেও (তা ব্যয় করা হবে)। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরাঃ আত তাওবাহ্ ৯:৬০]

এই আয়াতে সাদাকাহ উল্লেখ থাকলেও, যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে যাকাতও এক প্রকার সাদাকাহ। সেই অনুযায়ী এখানে ৮ শ্রেণির মানুষকে যাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যথা:

১) فقير – গরীব
২) مسكين – দুস্থ
৩) العاملين عليها – যাকাত সংগ্রহকারীগণ
৪) المؤلفة قلوبهم – ইসলামের প্রতি সদভাব সৃষ্টির জন্য
৫) الرقاب – দাসমুক্তির জন্য
৬) الغارمين – ঋণগ্রস্ত
৭) في سبيل الله – আল্লাহর পথে থাকা ব্যক্তি
৮) ابن السبيل – মুসাফির বা পথিক

কুরআনে যাকাতের ব্যাপক তাকিদ দেয়া হয়েছে। প্রায় যতবার কুরআনে নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ততবারই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত যা সমাজের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পরে যখন আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন আরবদের কিছু লোক (যাকাত আদায়ে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। তখন উমর (রাঃ) বললেন,

“আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? কারণ রসূল ﷺ বলেছেন, আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-কে স্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে সে তার সম্পদ ও প্রাণ আমার হাত থেকে সংরক্ষিত করে নিবে। তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত। আর অন্য সবকিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে।”

অতঃপর আবু বকর (রাঃ) বললেন, “আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করবে আমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব। কারণ যাকাত হচ্ছে আল্লাহর সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি উটের গলার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রসূল ﷺ -এর যামানায় দিত, তাহলে এ অস্বীকৃতির কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।”

উমর (রাঃ) বললেন, “আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম আল্লাহ আবু বকর (রাঃ)-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।” (বুখারী, ১৪০০; মিশকাত ১৭৯০)

যাকাতকে পবিত্রতা বলা কারণ এর মাধ্যমে ধনী তার মাল থেকে গরীবকে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেয় ফলে ঐ মাল তার ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়। যাকাতও একটি সাদাকাহ। কুরআনে এসেছে,

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَتُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَصَلِّ عَلَیۡہِمۡ

অর্থঃ (হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ করবে। [সূরাঃ আত-তাওবাহ্ ৯:১০৩]

যাকাতের মাধ্যমে সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরীবদের মাঝে বন্টন এর মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি যে কখনোই দারিদ্র্য দূর করতে পারে না, বর্তমান সৌদি আরবের দিকে লক্ষ্য করলে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেখানে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে যাকাত গ্রহণ করার মত দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। যাকাতের অর্থ অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করতে হয়। অপরদিকে, ক্ষুদ্র ঋণের দোহাই দিয়ে যে দেশে যত সুদভিত্তিক অর্থনীতি চলছে সে দেশে দারিদ্র্যের হার তথ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩১]

যাকাত দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়। ধনীরা যখন যাকাত আদায়ের মাধ্যমে গরীবদের সহযোগিতা করে তখন গরিবরা তাদের সমর্থ্য অনুযায়ী ধনীদের উপর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে পরে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়।[৩০]

وَاَحۡسِنۡ كَمَاۤ اَحۡسَنَ اللّٰهُ اِلَيۡكَ

অর্থঃ এবং আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের প্রতি) অনুগ্রহ কর। [সূরাঃ আল ক্বাসাস ২৮:৭৭]

নি:সন্দেহে মানুষের কাছে তার সম্পদ অত্যন্ত প্রিয়। সেই সম্পদের একটা নির্দিষ্ট অংশ যখন সে শুধুমাত্র আল্লহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টির জন্য দিয়ে দেয়, তখন তার হৃদয় কৃপণতা ও লোভ থেকে মুক্ত হয়ে উদার, পরোপকারী ও পরিশুদ্ধ হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَنۡ يُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

অর্থঃ যারা স্বভাবগত কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম। [সূরাঃ আল হাশর ৫৯:৯]

আরেক স্থানে এসেছে,

الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ◑ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

অর্থঃ যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারাই সফলকাম। [সূরাঃ লুকমান ৩১: ৪-৫]

৫.৪ রোযা

আরবী শব্দ صَوْم এর আভিধানিক অর্থ কাজ থেকে বিরত থাক, কঠোর সাধনা করা, অবিরাম প্রচেষ্টা, আত্মসংযম ইত্যাদি। বাংলায় সাওম শব্দটির তুলনায় এর ফারসি পরিভাষা রোযা (روزه) শব্দটি অধিক প্রচলিত।

আবুল হোসেন কুদূরী ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা।[২৬]

মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, সাওম হল সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে পানাহার থেকে বিরত থাকা।[২৬]

রোযা ইসলামের চতুর্থ রুকন। প্রত্যেক বালেগ, বিবেকবান মুসলমানের জন্য রমজান মাস জুড়ে রোজা রাখা ফরজ। যে কেউ একে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ۙ
অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। [সূরাঃ আল বাকারা ২:১৮৩]

রোযার সময়সীমা হচ্ছে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এই সময়ের মাঝে রোজাদারকে সকল প্রকার পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লহ বলেন -

وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الۡخَيۡطُ الۡاَبۡيَضُ مِنَ الۡخَيۡطِ الۡاَسۡوَدِ مِنَ الۡفَجۡرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيۡلِ
অর্থঃ আর যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। [সূরাঃ আল বাকারা ২:১৮৭]

রমজানের রোযা রাখার নিয়ম হচ্ছে -

- নিয়ত: সুবহে সাদিকের পূর্বেই রোযার নিয়ত করে নেয়া। এক্ষেত্রে মনে মনে নিয়ত করাই যথেষ্ট, মুখে বলা জরুরী নয়। তবে নিয়ত করা আবশ্যক। প্রতিটি রোযার জন্য আলাদা নিয়ত করতে হবে, একবার একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়।

- সাহরী: সুবহে সাদিকের পূর্বে ভোর রাতে যে পানাহার করা হয় সেটিই সাধারণত সাহরী নামে পরিচিত। সাহরী বাধ্যতামূলক নয়, সাহরী করা ছাড়াও রোযা রাখা যাবে। তবে হাদীসে এসেছে, সাহরী কর, কারণ সাহরীতে বরকত আছে (বুখারী, ১৯২৩)

- বিরত থাকা: রোযা অবস্থায় কেবল পানাহার নয় বরং, যৌন সম্পর্ক, গালি, মিথ্যা, ঝগড়া প্রভৃতি খারাপ কাজ থেকেও বিরত থাকতে হবে। রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যাক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তাঁর এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, ১৯০৩)

- ইফতার: মাগরিবের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করার মাধ্যমে একটি রোযা শেষ হয়। ইফতারের সুন্নত হচ্ছে খেজুর দিয়ে ইফতার করা। তা না পেলে মিষ্টি জাতীয় কিছু এবং তা-ও না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করা।

- কাযা: হায়েজ, নেফাস, ও অন্যান্য অসুস্থতা বা সফররত থাকার কারণে যদি রোযা রাখা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী সময়ে অবশ্যই এর কাযা আদায় করে দিতে হবে।

রোযার দিনে অনুমতি না থাকলেও আল্লহ তা'আলা রাতে অর্থাৎ ইফতারীর পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত সহবাসে অনুমতি দিয়েছেন।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ
অর্থঃ রোযার রাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। [সূরাঃ আল বাকারা ২:১৮৭]

রমজানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল ই’তিকাফ। ই’তিকাফ হলো এই যে - রোযাদার নিয়ত সহকারে মসজিদে অবস্থান করবে। মহিলারা নিজ ঘরে স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়ে ই’তিকাফ করবেন। রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া।

মহল্লার পক্ষ থেকে দুই একজন করলে বাকিরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ না করলে সবাই দায়ী হবে। ই'তিকাফরত অবস্থাতে দিন-রাত সবসময়েই সহবাস নিষিদ্ধ।

وَلَا تُبَاشِرُوۡہُنَّ وَاَنۡتُمۡ عٰکِفُوۡنَ ۙ فِی الۡمَسٰجِدِ ؕ تِلۡکَ حُدُوۡدُ اللّٰہِ فَلَا تَقۡرَبُوۡہَا ؕ
অর্থঃ আর তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) সহবাস করো না, যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাক। এসব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। সুতরাং তোমরা এগুলোর নিকটে যেও না। [সূরাঃ আল বাকারা ২:১৮৭]

রোযা একটি শারীরিক ইবাদত। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, রোযার মাধ্যমে দেহের বহুবিধ উপকারিতা সাধিত হয় -

- টক্সিন দূর করে
- ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বা, হজমতন্ত্র বিশ্রাম পায়
- ওজন নিয়ন্ত্রণ হয়
- রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
- রক্তশর্করা স্বাভাবিক হয়
- খাদ্যের প্রতি সংযম অভ্যাস হয়
- স্বাস্থকর খাদ্যাভাস গড়ে ওঠে[৩৪]

রোযা একটি আত্মিক ইবাদত-ও। এতে রয়েছে সংযম ও তাকওয়ার ট্রেনিং। এতে রয়েছে নিরাপত্তা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে ঘর পাওয়ার মহাসফলতা। যে ব্যক্তি এ মাসে লাভবান হতে পারবে না তাহলে সে আর কখন লাভবান হবে? যে ব্যক্তির ওপর আল্লাহ এ মাসে রহম করবেন সে তাঁর রহমতপ্রাপ্ত হবে আর যে ব্যক্তি তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে সে প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! রমযান মাস এসেছে, তবে কী দো‘আ পড়বো?”
তিনি বলেন, “তুমি বলবে,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী, ৩৫৩১; ইবনে মাজাহ, ৩৮৫০)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, “তোমাদের নিকট রমযান মাস উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের ওপর আল্লাহ তা‘আলা এ মাসের সাওম ফরয করেছেন।

এ মাস আগমনের কারণে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়।

এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল।” (নাসাঈ, ২১০৬; মুসনাদে আহমাদ, ৭১৪৮)

সহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিমে) আবু হুরায়রা (র:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়।

মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, কিন্তু সাওম ব্যতীত। কেননা তা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেবো। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য কামাচার ও পানাহার পরিত্যাগ করে।

সাওম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু’টি খুশী যা তাঁকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।

সাওম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম”। (বুখারী, ১৯০৪; মুসলিম ১১৫১)

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাস পর্যন্ত পৌঁছার দো‘আ করতেন। তিনি রজব মাস আসলে বলতেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ আমাদেরকে রজব ও শা‘বান মাসে বরকত দান করুন এবং রমযান মাস পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছান (হায়াত দান করুন)। (মুসলিম, ১০৭৯)

৫.৫ হজ্জ

হজ্জ বা হজ্ব (حج) আরবী শব্দ। এটি ইসলামের পঞ্চম রুকন। হজ্ব শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যের সমন্বিত একটি ইবাদত। সুতরাং উভয় দিক থেকে সামর্থ্যবান হতে হবে। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচাপাতি ও আসবাবের অতিরিক্ত হজ্বে যাওয়া-আসার ব্যয় ও হজ্ব আদায়কালীন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষম মুসলিমের উপর হজ্ব ফরজ হয়। হাদীসে এসেছে, হজ্ব (ফরয) হলো একবার, এরপর যে অতিরিক্ত আদায় করবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। (মুসনাদে আহমাদ, ২৩০৪; সুনানে দারেমী, ১৭৮৮)

আল্লহ বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا ؕ وَمَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ

অর্থঃ মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয। কেউ (এটা) অস্বীকার করলে আল্লাহ তো বিশ্ব জগতের সমস্ত মানুষ হতে বেনিয়ায। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:৯৭]

হজ্ব তিন প্রকার, যথাঃ

1. **হজ্বে ইফরাদ:** শুধু হজ্বের নিয়তে ইহরাম করা এবং হজ্ব শেষে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাওয়া

2. **হজ্বে ক্বিরান:** ক্বিরানের আভিধানিক অর্থ হল দুটি জিনিসকে একত্র করা। শরীয়তের পরিভাষায়, ক্বিরান অর্থ হল মীক্বাত থেকে হজ্ব ও উমরার নিয়তে একত্রে ইহরাম বাঁধা। এক্ষেত্রে প্রথমে উমরার আমল করবে, তারপর একই ইহরামে হজ্বের আমল করবে।

3. **হজ্বে তামাত্তু:** হজ্বের মাসে প্রথমে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করবে। তারপর উমরার তাওয়াফ, তাওয়াফের দু’রাকাআত নফল নামাজ আদায় করে উমরার সাঈ করবে। এরপর উমরার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং জিলহজ্বের ৮ তারিখের আগ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবে। এসময় হালাল অবস্থার সমস্ত সুযোগ সুবিধা সে ভোগ করতে পারবে।

৮ তারিখে সে মক্কার অধিবাসী হিসেবে মক্কা থেকে হজ্বের ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্বের আমল করবে।

উল্লেখ্য সওয়াবের দিক থেকে সর্বোত্তম হল কিরান, তারপর তামাত্তু, এরপর ইফরাদ।[২৬]

হজ্বের ফরয তিনটি যা অবশ্য পালনীয়। যথাঃ

1. **ইহরাম বাঁধা:** ইহরাম (الاحرام) শব্দটি হারাম শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ কোনো জিনিসকে নিজের ওপর হারাম বা নিষিদ্ধ করে নেয়া। এই ইহরাম-ই হজ্ব ও উমরার প্রথম কাজ। ইহরামের মূল বিষয় হচ্ছে হজ্ব বা উমরার নিয়তে তালবিয়া পাঠ। এর দ্বারাই ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়। ইবনে উমার (র:) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাথায় সিঁথি করা অবস্থায় ইহরামের তালবিয়া পাঠ করতে দেখেছি। তিনি বলেছেন,
لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ
এই বাক্যগুলোর অতিরিক্ত কিছু বলেননি। (মুসলিম, ১/৩৭৬)
তবে ইহরামের সুন্নতি তরীকা হলো মোচ, নখ, লোম চেঁছে বা কেটে পরিষ্কার করা, গোসল করা, সম্ভব না হলে ওযু করা তারপর পুরুষেরা ২টি সাদা চাদর - একটি লুঙ্গির মতো এবং অপরটি চাদর হিসেবে পরিধান করবে। মহিলাগণ স্বাভাবিক কাপড় পড়বে। তাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় জুতা, মোজা পড়ার অবকাশ রয়েছে। সম্ভব হলে দুই রাকাআত নফল নামাজ পড়বে। তারপর যে হজ্ব আদায়ের ইচ্ছা সে অনুযায়ী নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করবে।

2. **আরাফায় অবস্থান:** ৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের অন্যতম আমল। আরাফার ময়দান মক্কা থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রসূল ﷺ বিদায় হজ্বে এখানেই ভাষণ দিয়েছিলেন। ৯ জিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উত্তম। জোহরের আগে আরাফার ময়দানে এসে হাজির হওয়া সুন্নত। এ ময়দানে প্রদত্ত খুতবা শ্রবণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দুআ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত করতে হয়। সূর্যাস্তের পর হাজীগণ মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

3. **তাওয়াফে যিয়ারত:** এই তাওয়াফ আদায়ের সময় হল ১০ জিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর থেকে ১২ জিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এর মাঝে এই তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে।

এই তাওয়াফ আদায়ের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনের জন্য হালাল হবে না। এই তাওয়াফটি না করলে হজ্ব-ও আদায় হবে না।

হজ্বে ওয়াজিব ৬টি যথাঃ

1. সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার সাঈ করা
2. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা
3. মিনায় তিন শয়তান (জামারাত) সমূহকে পাথর নিক্ষেপ করা
4. হজ্বে তামাত্তু ও কিরান আদায়কারীগণ হজ্ব সমাপনের জন্য দমে শোকর আদায় করা
5. ইহরাম খোলার পূর্বে মাথার চুল মুন্ডন করা বা ছাঁটা
6. মক্কার বাইরের লোকদের জন্য, বিদায়কালীন তাওয়াফ করা

ফরজ ছুটে গেলে হজ্বই হবে না। আর ওয়াজিব ছুটে গেলে দম দিতে হবে। দম হলো হজ্ব-উমরা আদায়ের ওয়াজিব ছুটে যাওয়া জনিত ভুল ত্রুটির কারণে কাফফারা স্বরূপ একটি পশু যবেহ করা। এর গোশত গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়। একেই তো দম বলে।

ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হজ্জের কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

- ইহরাম বাঁধা
- ৮ জিলহজ মিনায় অবস্থান
- ৯ জিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা, সারাদিন সেখানে অবস্থান
- সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশ্য রওনা হওয়া, সেখানে রাত্রি যাপন
- ১০ জিলহজ মিনায় বড় জামারাকে কঙ্কর মারা, কুরবানী করা, মাথার চুল ফেলে দেয়া
- ১১, ১২ জিলহজ মিনায় জামারাকে কঙ্কর মারা
- ১২ জিলহজের মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত, সাঈ করা
- বিদায়ী তাওয়াফ

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মাঝে মদীনায় গমন করার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল নবীপ্রেমী মুসলমান হজ্জের আগে বা পরে একটা সময়ের জন্য মদীনায় ছুটে যান এবং প্রিয় নবীজীর রওজা মুবারকে দরূদ ও সালাম পেশ করেন।

اَلّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّد ﷺ

হে আল্লহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

হজ্ব করার ফজিলত অপরিসীম। হজ্ব চলাকালীন কোনো ধরনের ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি করা নিষেধ। যে এরূপ করতে পারে আশা রাখা যায় ঐ হজ্ব তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মুছে দিবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "

অর্থঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যাক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ (হজ্জ) করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তাঁর মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে। (বুখারী, ১৫২১; মুসলিম ১৩৫০)

হাদীসে আরো এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ".

অর্থঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ’উমরার পর আর এক ’উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হল হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান। (বুখারী, ১৭৭৩; মুসলিম ১৩৪৯)

নারীদের জন্য জিহাদ হল হজ্বে মাবরূর। মাবরূর। শব্দের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে যে হজ্বের মধ্যে কোনো গুণাহের সংমিশ্রণ ঘটেনি।[৩৫] ইমাম কুরতুবী বলেনঃ মাকবূল-এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে যার সারমর্ম প্রায় একই। অতএব, মাকবূল হজ্জ বলতে তাই বুঝায় যে হজ্জে তার সকল নিয়মাবলী যথার্থ পালিত হয়েছে এবং হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার ওপর করণীয় কার্যসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদন করেছে তাই হজ্জে মাবরূর তথা মাকবূল হজ্জ। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ " لاَ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ".

অর্থঃ উম্মুল মু’মিনীন ’আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেনঃ না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আমল হল, হাজ্জে মাবরূর। (বুখারী, ১৫২০; সুনানে নাসায়ী, ৩৬০৭)

হযরত বুরাইদা (র:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف

অর্থঃ হজের জন্য খরচ করা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মতই ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। (শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, ৪১২৫, তাবারনী, ৫২৭০)

হাদীসে এসেছে,

يغفر الله الحاج ولمن استغفر له الحاج

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা হাজীদের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং হাজীগণ যাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাদেরকে-ও ক্ষমা করেন। (মুসতাদরাকে হাকীম, ১৬৫৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা, ১৫১৬)

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামী শরীয়ত

৬.১ শরীয়তের পরিচয়

শরীয়ত (شريعة) শব্দের আক্ষরিক অর্থ পানি পৌঁছানোর পথ, সুস্পষ্ট রাস্তা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি। পরিভাষায়, ইসলামী শরীয়ত হল আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা, সামাজিকতা, পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে। ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে একজন মুসলমান শান্তি, সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কুরআনে এসেছে,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

অর্থঃ তিনি (শরীয়ত হিসেবে) তোমাদের জন্য দীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। [সূরাঃ আশ্-শূরা ৪২:১৩]

এ আয়াতে জানানো হয়েছে, শরয়ী বিধি-বিধানের ধারায় শুরু থেকে শেষ একই দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদির শিক্ষা সকল নবীই দিয়েছেন। পার্থক্য কেবল শাখাগত বিষয়ে। বিভিন্ন সময়ে ইবাদতের পন্থায় কিছুটা ভিন্নতা এসেছে। যেমন, বনী ইসরাইলদের জন্য ইবাদতের স্থান নির্দিষ্ট ছিলো, তারা অন্য কোথাও ইবাদত করতে পারত না। কিন্তু আল্লহ আমাদের ওপর রহম করেছেন এবং বিশ্বের যেকোনো স্থানে আমাদেরকে ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন।[৩৬] রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, "গোটা জমিন আমার জন্য নামাজ আদায় ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানেই নামাজের সময় হয় সেখানেই যেন নামাজ আদায় করে নেয়।" (বুখারি, হাদিস : ৪২৫)

এভাবে যখন যে নবীর সময়কাল, তখন সেই নবীর অনুসরণই মুখ্য। আর, আল্লহর হুকুমই চূড়ান্ত।

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ
অর্থঃ হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। [সূরাঃ আনআম ৬:৫৭, সূরাঃ ইউসুফ ১২:৪০]

আমাদের রসূল ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য। সুতরাং, এখন আর পুরাতন শরীয়ত অনুসরণে অবকাশ নেই, মানতে হবে কেবল আল্লহর রসূল ﷺ-এর আনীত বিধি-বিধান।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ
অর্থঃ (হে রাসূল!) আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর এবং যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। [সূরাঃ আল জাছিয়াহ ৪৫:১৮]

রসূল ﷺ এর আনীত দ্বীনই চূড়ান্ত, যেমনটা আল্লহ কুরআনে বলে দিয়েছেন,
اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:১৯]

তাফসীরে এসেছে, 'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহপ্রদত্ত এ ধর্মকে এই নামে অভিহিত করার কারণ হলো এ ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করে ও তাঁর যাবতীয় আদেশ শিরোধার্য করে। সে কারণেই এর অনুসারীকে মুসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী বলে। এমনিতে তো সকল আসমানী ধর্মই ইসলাম। কিন্তু প্রাচীন ধর্মগুলোকে যেহেতু তাদের অনুসারীগণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তা বিকৃত করে ফেলেছে, অবশেষে শেষ নবীর আবির্ভাবের পর তাঁর শরীআত দ্বারা সেগুলোর অনেক বিধান রহিতও হয়ে গেছে, তাই সেগুলো আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত থাকেনি। এখন ইসলাম হল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত দীন ও শরীআত, যা এক পরিপূর্ণ, সার্বজনীন ও কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী ধর্ম। আর, তাই আল্লহ বলেছেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:১৯]

৬.২ শরীয়তের উৎস

শরীয়ত হলো আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর দিকনির্দেশনার সমষ্টি। সেই অনুযায়ী, শরীয়তের প্রধান বা মৌলিক উৎস দুইটি। যথা- আল্লাহর বাণী কুরআন ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি (হাদীস)। পরবর্তীতে কুরআন ও সুন্নাহর স্বীকৃতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে শরীয়তের আরো দুইটি উৎস নির্ধারিত হয়। এগুলো হলো- ইজমা ও কিয়াস। সুতরাং, শরীয়তের উৎস মোট চারটি। যথাঃ

1. **কুরআন:** কিতাবুল্লহ, আল্লহর কিতাব। এটি আল্লহর পক্ষ থেকে রহমত ও হেদায়েত। আল্লহ বলেন,

   تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرَا ۟ۙ

   অর্থঃ মহিমময় সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দার প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য হয় সতর্ককারী। [সূরাঃ আল ফুরক্বন ২৫:১]

   অন্যত্র এসেছে,

   وَ مَنْ لَّمْ یَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

   অর্থঃ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারাই কাফির। [সূরাঃ আল মায়িদা ৫:৪৪]

   তাফসীরে এসেছে, আল্লাহর আইন অনুসারে না চলার কয়েকটি পর্যায় হতে পারে,[৩৭] যেমন:

   (১) আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে বিচার-ফয়সালা পরিচালনা জায়েয মনে করা।

   (২) আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা উত্তম মনে করা।

(৩) আল্লাহর আইন ও অন্য কোন আইন শাসনকার্য ও বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের মনে করা।

(৪) আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য কোন আইন প্রতিষ্ঠা করা। উপরোক্ত যে কোন একটি কেউ করলে সে সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে।

2. **হাদীস:** সুন্নতে রসূল ﷺ। আল্লহ বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অর্থঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর নিশ্চয় এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল। [সূরাঃ আলে ইমরান ৩:১৬৪]

সুতরাং, আল্লহ রসূল ﷺ যা কিছু শিক্ষা দেন তা-ও দ্বীনের-ই অংশ। আল্লহকে মানতে হলে রসূলের আনুগত্য করতে হবে।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

অর্থঃ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যারা (তাঁর আনুগত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি (হে নবী!) তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠাইনি (যে, তাদের কাজের দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে)। [সূরাঃ আন নিসা - আয়াত নংঃ ৪০]

অতএব, রসূল ﷺ ও তাঁর হাদীসকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামকে মানতে হলে তাকেও মানতে হবে।

3. **ইজমা:** ইজমা (إجماع) ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস ও মানদন্ড। ইজমা শব্দটির **جمع** শব্দমূল থেকে উৎপন্ন, যার আভিধানিক অর্থ মিশ্রণ, কিছুর মিশ্রিত বা একত্রিত বা সংগৃহীত রূপ, সমাবেশ, ঐক্যমত, দৃঢ় সিদ্ধান্ত বা, সংকল্প ইত্যাদি। ইসলামী

পরিভাষায়, রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যেকোনো যুগে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আহলে হক্ব মুজতাহিদ আলিমগণের সকলে যেকোনো শরয়ী বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হওয়াকে ইজমা বলে। (উসুলুল ফিকহীল ইসলামী)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা। [সূরাঃ আন নিসা ৪:১১৫]

‘এবং সে মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে’ আয়াতটির তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসির (রহ:) বলেন, যে ব্যক্তি শরীয়তের বিপরীত পথে চলে, শরীয়ত হয় এক দিকে এবং তার পথ হয় অন্যদিকে, রসূলুল্লাহ ﷺ এক দিকে চলার নির্দেশ দেন এবং সে অন্যদিকে চলে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সে দলীল প্রমাণাদি দেখেছে। তথাপি সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করতঃ মুসলমানদের সরল ও পরিষ্কার পথ হতে সরে পড়েছে, তখন আল্লহ-ও তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দিবেন। ঐ খারাপ পথই তখন তার নিকট ভাল বলে মনে হবে। অতঃপর সে জাহান্নামে গিয়ে পৌছে যাবে। মুসলমানদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ করা। কিন্তু কখনও তা হয় তো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্পষ্ট কথারই উল্টো, আবার কখনও কখনও ঐ জিনিসের বিপরীত হয় যার উপর রসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মত সবাই একমত রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তা'আলাই মুমিনগণের ইজমা বা ঐকমতকে ভুল হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।

হাদীসে এসেছে,

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান থেকে খুলে ফেললো। (আবু দাউদ, ৪৭৫৮)

ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহ:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যে ‘জামাআত’কে আঁকড়িয়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন সেটি হল (আহলে হক্ক মুজতাহিদ/মুহাক্কিক) আলেমগণের জামাআত। এটা এজন্য যে, আল্লহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর তাদেরকে হুজ্জত বা, দলীল বানিয়েছেন। সর্বসাধারণ (দ্বীনের ইলম রাখে না বিধায়) দ্বীনের কোনো ব্যাপারে আশংকা হলে (শরয়ী বিধান জানার জন্য) আলেমগণের কাছে ছুটে যেতে আদিষ্ট। কারণ, আলেমগণ হলেন (শরীয়তের) ব্যাখাকার। (আলেমগণের দিকে ইঙ্গিত করেই) রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

أن الله لن يجمع أمتي على ضَلالَة

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লহ আমার উম্মত (এর মুহাক্কিক আলেমগণ)-কে পথভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যমত করবেন না। (উমদাতুল কারী, আইনী ২৪/১৯৫)

4. **কিয়াস:** কিয়াস এর শাব্দিক অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা। আসলের কারণের (ইল্লত) অনুরূপ কারণ পাওয়ার ভিত্তিতে শাখার মধ্যে আসলের অনুরূপ হুকুম প্রয়োগ করাকে কিয়াস (قياس) বলে। (নূরুল আনওয়ার)

অর্থাৎ, নতুন উদ্ভূত কোন বিষয় বা মাসআলাকে ইসলামিক শরীয়তের মূল ভিত্তি - কোরআন ও সুন্নাহ-এ বর্ণিত বিধি বিধান বা উসুলের আলোকে নিরীক্ষণ করে দেখা যে তা কুরআন বা সুন্নাহর কোন বিধান বা উসূলের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে। সে অনুযায়ী এই উদ্ভূত বিষয়ের শরয়ী হুকুম কী হবে স্থির করা হয়।

রসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه

অর্থঃ যে ব্যাপারে (সরাসরি কোন ফয়সালা সহকারে) আমার উপর (কোনো ওহী) নাযিল হয় না, শুধু সেক্ষেত্রে আমি (আমার ওপর বিগত নাযিল হওয়া ওহীর আলোকে ইজতিহাদ করি এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং) তোমাদের দুজনের মাঝে আমার সিদ্ধান্ত অনুসারে ফয়সালা করে দেই। (বুখারী ৫/২১২, মুসলিম ৩/১৩৩৭)

রসূল ﷺ যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (র:)-কে ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠালেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে মুয়ায (كيف تقضي) তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?”

মুয়ায (র:) বললেন, “(أقضي بكتاب الله) আল্লহর কিতাব দিয়ে।”

তখন রসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "(فإن لم يكن في كتاب الله) যদি আল্লহর কিতাবে তা না থাকে?"

মুয়ায (র:) বললেন, "(فبسنة رسول الله) তাহলে আল্লহর রসূল ﷺ এর সুন্নত দিয়ে।"

রসূল ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "(فإن لم يكن في سنة رسول الله) যদি রসূলের (ﷺ) সুন্নতে তা না থাকে?"

মুয়ায (র:) বললেন, "(أجتهد رَأْيِي) তখন আমি ইজতিহাদ করে রায় দিব।"

তখন আল্লহর রসূল ﷺ বললেন, "الحمد لله الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ ﷺ لِمَا يُرْضِي رسولَهُ অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লহর যিনি তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যাতে আল্লহ ও আল্লহর রাসূল ﷺ সন্তুষ্ট।" (ইবনে তাইমিয়া (রহ:) মাজমুউল ফাতওয়া ১৩/৩৬৪, ইবনে কাসীর ১/১৩)

সুতরাং, প্রথমে আল্লহর কিতাব, কুরআন থেকে দলীল নেয়া হবে। তারপর রসূল ﷺ এর হাদীস দ্বারা। তারপর সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালা দ্বারা। তাঁরা যে বিষয়ে সর্বসম্মত, সে বিষয়ে আমরা আমল করব। এরপর পূর্ববর্তী যুগের এবং বর্তমান যুগের উলামাগণের ইজমা এবং পরিশেষে কিয়াস অনুযায়ী দলীল নেয়া হবে।

সময়ের সাথে উদ্ভুত নতুন ফিকহী মাসআলা'র সঠিক সমাধানে ইজমা ও কিয়াসের কোনো বিকল্প নেই। আর, আল্লহর কিতাব ও সুন্নতে রসূল ﷺ এর মাঝে লুকায়িত বিধি-বিধান খুঁজে এনে বিভিন্ন শরয়ী সমস্যার সমাধান কেবল তিনি-ই দিতে পারেন, যিনি এই বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন, দ্বীনের পরিভাষায় যাকে বলে 'আলেম', যারা 'জানেন'। সুতরাং, সাধারণ মুসলমানের দায়িত্ব হল হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সাথে সংযুক্ত থাকা এবং যেকোনো সমস্যায় তাদের দারস্থ হওয়া।

৬.৩ শরীয়তের শাখা

ইসলামী শরিয়তের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। তার মাঝে প্রধান শাখাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল:

1. **আকীদা (বিশ্বাস):** আকীদা হল ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ যা, হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকে এবং এদের সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। এর প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

উপাদান	**সংক্ষিপ্ত পরিচয়**	**উদাহরণ**
তাওহীদ	আল্লাহ এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই	সূরা ইখলাস (১১২:১) – قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
রিসালাত	হেদায়াতের বাণী দিয়ে আল্লহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রসূল পাঠিয়েছে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হলেন শেষ নবী ও রসূল	সূরা আহযাব (৩৩:৪০) – وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
আখিরাত	কিয়ামত ও হিসাবের দিন রয়েছে এবং তা আল্লহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, অতঃপর হয় পুরস্কার (জান্নাত) নয়ত শাস্তি (জাহান্নাম)	সূরা হজ্জ (২২:৭) – لَا رَيْبَ فِيهَا

2. **ইবাদত:** ইবাদত হলো আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য বিনয় প্রেম ও ভয়ের মিশ্রণে কৃত কাজ তার উদ্দেশ্য শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি। এর প্রধান বিষয়াবলি নিম্নরূপ:

ইবাদত	**সংক্ষিপ্ত পরিচয়**	**উদাহরণ**
সালাত	দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ	সূরা বাকারা (২:৪৩) – وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
সাওম	রমাদানে রোজা পালন	সূরা বাকারা (২:১৮৩) – كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
যাকাত	ধনীদের সম্পদ থেকে বাধ্যতামূলক দান	সূরা বাকারা (২:৪৩) – وَآتُوا الزَّكَاةَ
হজ	সক্ষম ব্যক্তির বাধ্যতামূলক হজ	সূরা আলে ইমরান (৩:৯৭) – حِجُّ الْبَيْتِ

3. **মুআমালাত (লেনদেন):** মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ব্যবসা চুক্তি বিবাহ তালা উত্তরাধিকার এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত বিধানসমূহ। এর প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

বিষয়	**পরিচয়**	**উদাহরণ**
বিবাহ	পারিবারিক জীবন প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা	সূরা নিসা (৪:৩) – فَانْكِحُوا

তালাক	বৈবাহিক বন্ধনের সুশৃঙ্খল সমাপ্তি	সূরা বাকারা (২:২২৯) – الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
বাণিজ্য ও চুক্তি	লেনদেন, ব্যবসা, প্রতিশ্রুতি সুদ, ঘুষ ইত্যাদি নিষিদ্ধ	সূরা মায়িদা (৫:১) – أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
উত্তরাধিকার	সম্পদ বণ্টনের জন্য আল্লহ প্রদত্ত সুনির্ধারিত বিধি-বিধান	সূরা নিসা (৪: ১১-১২)

4. **মুআশারাত: (সামাজিক জীবন):** মানুষের সামাজিক জীবন পারিবারিক সম্পর্ক প্রতিবেশীর অধিকার নৈতিকতা এবং চরিত্র গঠনের বিধান। এর প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

বিষয়	**পরিচয়**	**উদাহরণ**
নৈতিকতা	ন্যায়, উপকার, সততা	সূরা নাহল (১৬:৯০)16:90 – يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
পরিবারের হক আদায়	মা-বাব, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সদাচারণ, তাদের যথাযথ হক আদায়	সূরা নিসা (৪:১৯) 4:19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ –

সামাজিক অধিকার আদায়	প্রতিবেশীর হক আদায়, মুসলিম ভাইয়ের হক আদায়, অমুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব, নৈতিক-সামাজিক দায়িত্ব	বুখারী, ৬০১৪ – "জিবরাইল (আ:) কর্তৃক প্রতিবেশী সম্পর্কে তাকিদ..."

5. **রাষ্ট্রনীতি:** ইসলামের রাষ্ট্র-পরিচালনা নীতি, নিরাপত্তা, শান্তি, প্রশাসন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার বিধান। এর প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

বিষয়	**পরিচয়**	**দলীল**
শাসনব্যবস্থা	নেতৃত্ব, দায়িত্ব ও আমানত	সূরা নিসা (৪:৫৮) – تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
বিচার	ন্যায়সঙ্গত রায় দেওয়া	সূরা নিসা (৪:৫৮) – أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
সমরনীতি	দ্বীন প্রতিষ্ঠা, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা	সূরা হাজ্জ(২২:৩৯) – أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	শান্তিচুক্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা	সূরা আনফাল (৮:৬১) – فَاجْنَحْ لَهَا

6. **দন্ডবিধি (বিচার ও শাস্তি):** অপরাধ প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত শাস্তিবিধি। এর প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

ধরণ	**সংক্ষিপ্ত পরিচয়**	**দলীল**
হুদুদ	নির্ধারিত অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি (চুরি, ব্যভিচার, মদ, অপবাদ);	সূরা বাকারা (২:২২৯) – تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
কিসাস	হত্যা/আঘাতের অনুরূপ হত্যা/আঘাত	সূরা বাকারা (২:১৭৯) – فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
তাজির	বিচারকের বিবেচনাধীন শাস্তি	(সাহাবা ও চার মাজহাবের ঐক্যমত – *ইজমা*)

৬.৪ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য

শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য হলো সেই সকল কারণ যার কারণে শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। ইমাম শাতিবি (রহ.) এর মত অনুযায়ী শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো পাঁচটি, যথাঃ

1. **দ্বীন রক্ষা (حفظ الدين):** ইসলাম আল্লহর মনোনীত দ্বীন। আল্লহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। তাই আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। বিজয়ী করার এই প্রক্রিয়ায় মানুষ যাতে সঠিক পথের উপর থাকতে পারে, মুসলমানরা যাতে লাভবান হতে পারে, তাদের মর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায় তাই ইসলামী শরিয়তে দ্বীন রক্ষামূলক বিভিন্ন হুকুম-আহকাম দেয়া হয়েছে। এতে কাফেরদের

অবস্থান যাই হোক না কেন, আল্লহ তা'আলা তো বেনিয়ায। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে,

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللهِ بِاَفْوَاہِہِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِہٖ وَلَوْ كَرِہَ الْكٰفِرُوْنَ

অর্থঃ তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তার নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফেরদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক। [সূরাঃ আস সাফ ৬১:৮]

দ্বীন রক্ষা বিষয়ক কিছু কর্মকান্ড হলো:

- মানুষের বিশ্বাস ও উপাসনাকে সুরক্ষিত রাখা
- নামাজ আদায় বাধ্যতামূলক করা
- ধর্মত্যাগ নিষিদ্ধ করা
- দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার
- ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
- চরমপন্থা ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি

2. **জীবন রক্ষা (النفيس حفظ):** জীবন আল্লহর দান। একে রক্ষা করা ফরয। কুরআনে এসেছে,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاہَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْہُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْہُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

অর্থঃ কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা অন্য কাউকে হত্যা করার কারণে কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারের কারণে না হয়, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কারও প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণরক্ষা করল। বস্তুত আমার রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে, কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে বহু লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনই করে যেতে থাকে। [সূরাঃ আল মায়িদাহ ৫:৩২]

জীবন রক্ষা বিষয়ক কিছু কর্মকাণ্ড হলো

- মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষা করা
- হত্যা ও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করা
- কিসাস প্রবর্তন
- ফৌজদারী আইন প্রয়োগ

- স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা
- সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রতিরোধ ইত্যাদি

3. **বুদ্ধি রক্ষা (العقل حفظ):** শয়তানের শত্রুতা আদম ও বনী আদম তথা, আদম-সন্তানদের সাথে। তাই সে চায় বনী আদমকে ধোকা দিয়ে বিপথগামী করতে। এটা তখনই সহজ হয় যখন মানুষ তার কান্ড-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যা হয় মদ, জুয়া, বাজনা ইত্যাদির দ্বারা। তাই ইসলামে এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থঃ শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজই বপণ করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং, তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে? [সূরাঃ আল মায়িদাহ ৫:৯১]

বুদ্ধি রক্ষা বিষয়ক কিছু কর্মকাণ্ড হলো

- মানুষের চিন্তা ও মেধাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা
- মাদক ও মদ নিষিদ্ধ করা
- মাদকবিরোধী আইন করা
- জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ
- মানসম্মত শিক্ষা বিস্তার
- গবেষণা ও উদ্ভাবন উৎসাহিত করা ইত্যাদি

4. **বংশ ও পরিবার রক্ষা (النسل حفظ):** মানুষের জীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি তার পরিবার ও বংশ ঠিক না থাকে, এখানে বিশৃঙ্খলা হয়, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করা এক কথায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ইসলামে বংশ ও পরিবার রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিবাহ বংশ পরিচয় রক্ষার জন্য আল্লহ ও তাঁর রসূল কর্তৃক অনুমোদিত হালাল প্রথা। হাদীসে এসেছে,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَه وِجَاءٌ.

অর্থঃ হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে এবং যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ’সওম’ পালন করে। কেননা, সওম যৌন ক্ষমতাকে দমন করে। (বুখারী ৬৭/২; মুসলিম ১৬/১, হাঃ ১৪০০, আহমাদ ৪০৩৩)

বংশ ও পরিবার রক্ষা বিষয়ক কিছু কর্মকাণ্ড হলো

- বংশ ও পরিবার পরিচয় কে বিশুদ্ধ রাখার জন্য বিবাহের অনুমোদন
- ব্যভিচার ও অপবাদ নিষিদ্ধকরণ
- পারিবারিক আ ইন প্রণয়ন
- যৌন হয়রানি ও ব্যভিচার দমন
- পরিবার ও সন্তান লালন পালনে সহায়তা প্রদান

5. **সম্পদ রক্ষা (المال حفظ):** সম্পদ ও তার যথাযথ ব্যবহার মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থিতিশীল অর্থনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শরীয়তে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কুরআনে এসেছে,

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে এই উদ্দেশ্যে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোনও অংশ জেনে শুনে পাপের পথে গ্রাস করবে। [সূরাঃ আল বাকারা - আয়াত নংঃ 188]

সম্পদ রক্ষা বিষয়ক কিছু কর্মকাণ্ড হলো

- মানুষের সম্পদ ও অর্থনৈতিক স্থিতি রক্ষা ও ন্যায়সংগতভাবে বৃদ্ধি করা
- চুরি, সুদ, প্রতারণা, ঘুষ নিষিদ্ধকরণ
- যাকাত আদায়ের নির্দেশ
- দুর্নীতিবিরোধী আইন
- ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা
- ব্যক্তিগত সম্পদের সুরক্ষা

৬.৫ শরীয়তের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীয়তের কিছু খাস বৈশিষ্ট্য যা উল্লেখ না করলেই নয়, তা নিম্নরূপ:

- **স্রষ্টা কর্তৃক প্রণীত - সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান**: ইসলামী শরিয়াহ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিধান, তাই এটি মানুষের তৈরি আইনের মতো সীমাবদ্ধ বা ত্রুটিপূর্ণ

নয়। এটি সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এটা কোনো সৃষ্টি নয় বরং স্রষ্টার প্রণীত বিধান। তিনি সর্বজ্ঞ, আল-আলিম এবং প্রজ্ঞাময়, আল-হাকীম

- **সর্বজনীন - সব যুগ, সব জাতির জন্য:** ইসলামের বিধান কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল, জাতি বা সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন ও সুন্নাহ এমনভাবে প্রণীত যে তা চিরকালের জন্য সভ্যতার প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম।

- **পূর্ণাঙ্গ - জীবনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত:** ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৈতিকতা, যুদ্ধ, শান্তি - ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য পথনির্দেশ দিয়েছে। কোনো দিকই অবহেলিত নয়।

- **ন্যায়ভিত্তিক - বৈষম্যহীন:** ইসলামী আইন ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কঠোর; ধনী-গরিব, শাসক-প্রজাসহ সবার জন্য একই আইন প্রযোজ্য। ব্যক্তির মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান রক্ষায় এটি বৈষম্যহীন নীতি অনুসরণ করে।

- **দয়া ও সহজীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত:** ইসলাম মানুষকে কষ্ট দিতে আসে নি; বরং দায়িত্বসমূহ এমনভাবে নির্ধারণ করেছে যেন তা সহজে পালনযোগ্য হয়। কুরআনে এসেছে:

  يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

  অর্থঃ আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না [সূরাঃ আল বাকারা ২:১৮৫]

- **স্কেলযোগ্য অবকাঠামো**
  - অপরিবর্তনীয় অংশ - কিছু অংশ অপরিবর্তনীয়, ইসলামের শুরুতে যা ছিলো তাই - এমন বিষয় হলো আকীদা, ইবাদত, নৈতিকতা ইত্যাদি
  - স্কেলযোগ্য অংশ - সময়ের সাথে যুগের পরিবর্তনে নতুন অনেক সমস্যার (মাসআলা) উদ্ভব হয়। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে যেসকল বিধি-বিধান ইসলামে ছিলো, আজও তা ব্যবহার করে উদ্ভুত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। কিয়ামত পর্যন্ত যত মাসআলার উদ্ভব হবে তা সমাধানের জন্য বিদ্যমান ইসলাম-ই যথেষ্ট। এটিই ইসলামের স্কেলযোগ্য অবকাঠামো।

- **কান্ড ও শাখা - কোনোটি কেটে ফেলার সুযোগ নেই:** ইসলামের প্রতিটি শাখা অপরটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। আকীদা ছাড়া ইবাদত হয় না, নৈতিকতা ছাড়া সমাজ টেকে না, শাসনব্যবস্থা ছাড়া ন্যায় কায়েম হবে না।

যখন কিছু অংশ মানা হয় আর কিছু অংশ মানা হয় না, তখনই নানা সমস্যা দেখা দেয়।

সপ্তম অধ্যায়: ইসলাম ও শিক্ষাব্যবস্থা

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইলম অর্থাৎ, জ্ঞান। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আর কোনো ধর্ম বা মতবাদ জ্ঞানকে ইসলামের মতো এত গুরুত্ব দেয়নি। ইসলামের সূচনাই হয়েছে "পড়ো" (اقرأ) - এই আদেশের মাধ্যমে। হাদীসের কিতাবগুলো ইলম বিষয়ে আলাদা অধ্যায়ই রচিত হয়েছে। সুতরাং, মানবসমাজের উন্নতি, নৈতিকতা ও সভ্যতার ভিত্তিমূল হলো জ্ঞান।

ইসলামের রয়েছে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা। সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগের সেই ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন বিষয়াদী পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশ ও সমাজ তাদের নিজস্ব কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করেছে, একে 'উন্নত' করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালকের দেয়া ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা কি সম্ভব? মোটেও না! তাই আজ চৌদ্দশ বছর পরেও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা আপন হিকমতে বিরাজমান। বরং, এই নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন অনেক বেশী।

৭.১ ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ

ইলম অর্জন আল্লহর নির্দেশ। কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে,

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ

অর্থঃ পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন। [সূরাঃ আল আলাক ৯৬:১]

আল্লহ কুরআন নাযিল করেছেন-ই যেন আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লহ তা'আলা নবীজী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন,

وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الذِّکۡرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیۡہِمۡ وَلَعَلَّہُمۡ یَتَفَکَّرُوۡنَ

অর্থঃ (হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে। [সূরাঃ আন নাহ্‌ল ১৬:৪৪]

আরও বলা হয়েছে,

قُلۡ ہَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَالَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

অর্থঃ বল, যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি সমান? [সূরাঃ আয্-যুমার ৩৯:৯]

আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন,

يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। [সূরা আল-মুজাদিলা ৫৮:১১]

জ্ঞান ছাড়া আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনা যায় না। যারা আল্লহর পরিচয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, প্রকৃতপক্ষেই তারাই আল্লহকে সেভাবে ভয় করতে সক্ষম হন যেভাবে করা উচিৎ।

اِنَّمَا يَخۡشَى اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا

অর্থঃ এবং মানুষ, পশু ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও আছে অনুরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য। আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানের অধিকারী। [সূরাঃ ফাত্বির ৩৫:২৮]

কুরআনে কারীমে আল্লহ তা'আলা আমাদেরকে ইলম বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে শিখিয়েছেন।

رَّبِّ زِدۡنِىۡ عِلۡمًا

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমাকে আরও উন্নতি দান কর। [সূরাঃ ত্বা-হা ২০:১১৪]

ইলম অর্জন আল্লহর রসূল ﷺ এর নির্দেশ। রাসূল ﷺ বলেন,

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। (ইবন মাজাহ, ২২৪)

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ঐ পরিমাণ দ্বীনী ইলম অর্জন করা ফরয যা দ্বারা সে দ্বীনের ফরয আমলগুলো পালন করতে পারে। ফরয হচ্ছে দ্বীনের ঐ সকল কাজ যা বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয়।

আরেক হাদীসে রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অর্থঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। (বুখারি ৭১, মুসলিম ১০৩৭)

অন্যত্র এসেছে,

لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

অর্থঃ দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না। (১) এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দান করেছেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে ন্যায়ের পথে তা খরচ করারও তাওফীক দিয়েছেন। (২) আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ও হেকমত দান করেছেন। সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, ৭৩; মুসলিম, ৮১৬)

এখানে, এ অর্থে ঈর্ষা করার কথা বলা হয়েছে যে আল্লহ আমাকেও অনুরূপ দিন। কিন্তু, ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তার ধ্বংস কামনা করা - এটা হারাম।

৭.২ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষত্ব

ইসলামী শিক্ষার অনন্য বৈশিষ্টাবলি একে অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিশেষ মর্যাদা দেয়। সামনে এমনই কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

- **আল্লহর নামে শুরু করা**
    - ইসলামে শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল ভালো কাজ আল্লহর নামের সাথে শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা এই যে -

      بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

      অর্থঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লহর নামে (শুরু করছি)

- **2D শিক্ষাব্যবস্থা**
    - ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যা মানুষকে একইসাথে ধর্মীয় (Deen) ও দুনিয়াবী (Dunya) শিক্ষায় শিক্ষিত করে। মুসলমান যেমন তাওহীদ, আখিরাত, রিসালাত, নামাজ, রোযা, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে শেখে, পাশাপাশি দুনিয়াবী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি যেমন মুআমালাত (ব্যবসায়িক নিয়মকানুন, নিকাহ, তালাক), মুআশারাত (সামাজিক শিষ্টাচার), রাষ্ট্রনীতি (শাসনব্যবস্থা, বিচার, সমরনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) ইত্যাদি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।

- **নৈতিকতা ও চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষা**

- অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষা শুধু দক্ষতা তৈরি করে, কিন্তু ইসলাম গড়ে তোলে সৎ, দায়িত্বশীল, নৈতিক মানুষ। ইসলাম এমন জ্ঞানকে সমর্থন করে যা মানুষের কল্যাণ, সভ্যতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে।

- **নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা**
    - ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ইলম অর্জন ফরয করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।'' [সূরা আত্-তাহরীম ৬৬: ৬]

এ আয়াতের অর্থ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এভাবে করেছেনঃ

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

অর্থঃ তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও এবং এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।[39]

- **ইলম শেখা এবং শেখানো**
    - ইসলামে ইলম শেখাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তেমনি শেখানোর প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে,

مَنْ جاء مسجدي هذا، يأته إلا لخير، يَتعلمه أو يُعلمه، فهو بِمنزلة المجاهد في سبيل الله

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু এ কারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। [সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, ৯৪১৯)

- **নববী তরিকায় শিক্ষা**
    - আল্লহর রসূল ﷺ-এর নিকট নানান শ্রেণী-পেশার সাহাবীগণ শিক্ষা নিতে আসতেন। লোকজন যাতে বিরক্ত না হয়ে পড়ে সে জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ নসীহতে ও ইলম শিক্ষাদানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

অর্থঃ, ইবনু মাস'ঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে নাসীহাত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত বোধ না করি। (বুখারী, ৬৮; মুসলিম ৫০/১৯)

- সকলের বুঝ সমান হয় না। আর সবসময় সমান মনযোগ রাখাও সম্ভব হয় না। তাই ভালোভাবে বোঝানোর জন্য নবী ﷺ গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো একই কথা তিনবার বলতেন।

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا، حَتَّى تُفْهَمْ عَنْهُ

অর্থঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাম দিতেন তখন তিনবার দিতেন। কোন কথা বললে তা তিনবার বলতেন। যাতে করে তা (ভালভাবে) বুঝা যায়। (বুখারী, ৯৪)

- **নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা**
  - সকল আমলের ক্ষেত্রে নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন আল্লহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখে। খালেস নিয়তের কারণ বাহ্যত ছোট অনেক আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার, নিয়তের গড়মিলে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়। তাই আল্লহর রসূল ﷺ সতর্ক করে দিয়েছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا

অর্থঃ যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোনো লোক যদি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, ৩৬৬৪)

- **আদব শেখা**
  - ইসলামে ইলম শেখার পূর্বে আদব শেখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইলম ধারক-বাহক ও শিক্ষকগণকে সম্মান করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ) বলেন,

كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم

অর্থঃ তারা যেমন ইলম শিক্ষা করতেন তেমনি আচার-আচরণও শিক্ষা করতেন। (আলজামি লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে, খতীব বাগদাদী ১/৭৯)

- **শিক্ষক নির্বাচনের প্রতি গুরুত্বারোপ**
  - ২.১ এ আমরা হযরত সালমান ফারসী (র:) এর কাহিনী তুলে ধরেছিলাম। তিনি দ্বীন অর্জনের জন্য লোকজনের কাছে সংবাদ নিয়েছেন, কে শিক্ষক হিসেবে সেরা হবে তা জেনে নিয়ে তবেই তার কাছে গিয়েছেন। এত যাচাই-

বাছাইয়ের পর তথ্য সঠিক হলেই কেবল তিনি তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্বাচনের এটাই উপযুক্ত পন্থা। ঠিক যেমন অসুখ হলে আমরা খোঁজ খবর নিই ঐ বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ভালো ডাক্তার কে আছেন, তেমনি দ্বীনী ইলম অর্জনের পূর্বে জেনে নিতে হবে কার কাছ থেকে ইলম নিচ্ছি। বিখ্যাত তাবেঈ ইবনে সিরীন (র:) বলেন,

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِيْنَكُم

অর্থঃ এই ইলম হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং, দেখে নাও কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছ। (সহীহ মুসলিম ১/১৪)

৭.৩ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বনাম আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

বর্তমান বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত অর্থনীতি-কেন্দ্রিক ও চাকরি-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। নৈতিকতা, মানবতা বা চরিত্র গঠনের প্রতি তেমন গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এর ফলস্বরূপ মানুষ শিক্ষিত হলেও দুর্নীতি বাড়ছে, পারিবারিক অবক্ষয়, সামাজিক সংকট, আত্মহত্যা, মানসিক চাপ, নৈতিক বিভ্রান্তি বেড়েই চলেছে। সংকটময় এই পরিস্থিতিতে আশার আলো হতে পারে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় চরিত্র, জ্ঞান ও দায়িত্ব - এই তিনের সমন্বয় ঘটে যা একটি সুস্থ সমাজ গড়তে অপরিহার্য।

নিচের ছকে সংক্ষেপে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হল:

বিষয়	**ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা**	**আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা**
মৌলিক উদ্দেশ্য	মানুষের চরিত্র, নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি, জবাবদিহিতা গঠন, পাশাপাশি, দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন।	চাকরি, পেশাগত দক্ষতা, উচ্চ আয়, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা।
জ্ঞানের উৎস	কুরআন ও সুন্নাহ'র যাবতীয়	দুনিয়ার উপকরণমূলক

	জ্ঞান	বিজ্ঞান (instrumental knowledge)। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অগ্রাহ্য বা অপ্রধান।
ভিত্তি ও কাঠামো	আখলাক, তাকওয়া, আত্মিক উন্নয়ন, আল্লাহর সন্তুষ্টি, মানবসেবা।	সেকুলার, মূল্যনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, নৈতিকতার চেয়ে উপযোগের দিকে মনোযোগ।
মানুষের প্রতি দৃষ্টি	মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত", দায়িত্ববান প্রতিনিধি হিসেবে দেখে।	মানুষকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদনশীল কর্মী হিসেবে দেখে।
শিক্ষার লক্ষ্য	সু-মানুষ গঠন, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতা, চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা + দুনিয়ার কাজে দক্ষতা।	প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, চাকরি, প্রতিযোগিতা, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো
শিক্ষার মডেল	নবীজী ﷺ এর মডেল: তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি), তালিম (শিক্ষা) ও তারবিয়াহ (চরিত্রগঠন) এর সমন্বিত রূপ	ইউরোপীয় রেনেসাঁ–পরবর্তী মডেল: বিজ্ঞান, শিল্প, প্রযুক্তি, গণতন্ত্র, অর্থনীতিনির্ভর
বিজ্ঞান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি	বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য আবিষ্কার করা যা ঈমানকে শক্তিশালী	বিজ্ঞানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা, যদিও এটি একটি ভুল

	করে	ধারণা। ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন
চূড়ান্ত উদ্দেশ্য	আল্লহর সন্তুষ্টি, জান্নাত	চাকরি ও অর্থনৈতিক উন্নতি

৭.৪ ইসলামী স্বর্ণযুগের বিজ্ঞানীদের অবদান

ইসলামী স্বর্ণযুগে, মুসলিম পণ্ডিতরা কুরআন ও হাদীসের তথ্যাদি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান নামক শাখাকে উন্মোচিত করেন। তাদের অবদান শুধুমাত্র ইসলামী সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি পুরো বিশ্বে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এই সময়ে মুসলিম পণ্ডিতরা বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেন এবং প্রাচীন গ্রিক, ভারতীয়, এবং পার্সিয়ান জ্ঞানকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেন।[৪০] মুসলিম বিজ্ঞানীদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হলো:

- **মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খোয়ারিজমি (Algorithmi/al-Khwarizmi)**
  - **ক্ষেত্র: গণিত, অ্যালজেব্রা, অ্যালগরিদম**
  - আল-খোয়ারিজমিকে "বীজগণিতের জনক" বলা হয়।
  - তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-কিতাব আল-মুখতাসার ফি হিসাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা" বীজগণিতকে স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। "Al-Jabr" শব্দ থেকেই "Algebra" এসেছে।
  - এছাড়া তাঁর অ্যালগরিদম বিষয়ক কাজ আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ক্যালকুলেশনের ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

- **ইবনে আল-হাইথাম (Al-hazen)**
  - **ক্ষেত্র: আলোকবিজ্ঞান (Optics), বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি**
  - আধুনিক অপটিক্সের ভিত্তি রচিত হয় তাঁর "কিতাব আল-মানাজির" গ্রন্থের মাধ্যমে।
  - তিনি আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও মানবদৃষ্টির প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেন।

- তাঁর গবেষণাকে আধুনিক অপটিক্স ও ক্যামেরা-অবস্কুরার ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।
- তিনি পরীক্ষনির্ভর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উন্নয়নে অন্যতম অগ্রদূত।

- **ইবনে সিনা (Avicenna)**
  - **ক্ষেত্র: চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন**
  - ইবনে সিনার রচনা "আল-কানুন ফি আল-তিব্ব" (The Canon of Medicine) প্রায় ৬০০ বছর ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলোর মেইন রেফারেন্স ছিল।
  - তিনি চিকিৎসা নীতিশাস্ত্র, চিকিৎসাব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেন, যা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তির অংশ।

- **জাবির ইবনে হাইয়ান (Geber)**
  - **ক্ষেত্র: রসায়ন**
  - তিনি "রসায়নের জনক" হিসেবে পরিচিত।
  - পাতন (distillation), পরিস্রবণ (filtration), ক্রিস্টালাইজেশন (crystallization), অ্যালকেমিক যন্ত্রপাতি উন্নয়ন - এসব মৌলিক পরীক্ষাগার কৌশল তাঁর হাতেই বিকশিত হয়।
  - আধুনিক রসায়নের ল্যাব টেকনিকগুলো তাঁর গবেষণার ওপর নির্মিত।

- **আল-জাজারি**
  - **ক্ষেত্র: যান্ত্রিক প্রকৌশল, রোবোটিক্স**
  - তার বই "কিতাব ফি মা'রিফাত আল-হিয়াল আল-হানদাসিয়া"–তে জলচালিত ঘড়ি, স্বয়ংচালিত যন্ত্র, কোডেড/প্রোগ্রামেবল মেশিনসহ অসংখ্য যান্ত্রিক আবিষ্কারের বিবরণ রয়েছে।
  - তাঁর ডিভাইসগুলোকে আধুনিক রোবোটিক্স ও অটোমেশন প্রযুক্তির প্রাচীনতম পূর্বসূরি হিসেবে ধরা হয়।

- **আবু বকর মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া আল-রাযি (Al-Razi / Rhazes)**

- **ক্ষেত্র: চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন**
- তিনি আল-হাওয়ী (Al-Hawi) নামক বিস্তৃত মেডিকেল এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছেন যা বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে মেডিকেল টেক্সটবুক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- হাম (smallpox) এবং হাম-জ্বর (measles) প্রথম পৃথকভাবে চিহ্নিত করেন।
- তাঁর বই কিতাব আল-জাদারি ওয়া আল-হাসাবাহ (Kitab al-Jadari wa al-Hasbah) চিকিৎসা ইতিহাসে এক মাইলফলক।
- তিনি রোগ নির্ণয়ে 'ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন' (clinical observation) এর গুরুত্ব আরোপ করেন যা আধুনিক evidence-based medicine-এর ভিত্তি।

৭.৫ ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান

ইসলাম ও বিজ্ঞান কখনো বিরোধী নয়। বরং, ইসলাম গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিকে উৎসাহ দিয়েছে। ফলে ৮ম থেকে ১৪শ শতক পর্যন্ত মুসলিমরা বিশ্ব বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিয়েছে।[৪০] ইসলাম মনে করে বিজ্ঞান হচ্ছে সেই চাবিকাঠি যার মাধ্যমে মানুষ তার বশে আনতে পারে সেই সকল সৃষ্টিকে যা আল্লহ তার অধীনস্ত করে দিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির মাঝে নিহিত সৌন্দর্য, কারিগরী দক্ষতা ও সুনিপুণ কুশলতা মানুষের সামনে স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরে। অথচ আজকাল সাধারণ মানুষ এমনকি কতিপয় মুসলমানরা পর্যন্ত সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত হয়ে মনে করে ইসলাম অতিপ্রাকৃত, বিজ্ঞান বিরোধী কোনো ব্যবস্থা। এখানে বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

- **ইসলামে জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির নির্দেশ:**

  ইসলাম মানুষকে চিন্তা-গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের দিকে আহ্বান করে। কুরআনের বহু আয়াত সরাসরি বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি (পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ) ব্যবহারের নির্দেশ দেয়:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

অর্থঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা সবই তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। [সূরাঃ আল জাছিয়াহ ৪৫:১৩]

অন্যত্র এসেছ,

اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ۟

অর্থঃ তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। [সূরাঃ আল গাশিয়াহ্ ৮৮:১৭]

- **কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস**

কুরআনে বহু প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা মাত্র কিছুদিন আগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে:

ثُمَّ خَلَقۡنَا النُّطۡفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقۡنَا الۡعَلَقَةَ مُضۡغَةً فَخَلَقۡنَا الۡمُضۡغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوۡنَا الۡعِظٰمَ لَحۡمًا * ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰهُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ ؕ

অর্থঃ তারপর আমি সেই নুতফাহ’কে আলাক্বহ'তে পরিণত করি। তারপর সেই আলাক্বহ'কে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দেই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দেই। তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান! [সূরাঃ আল মু'মিনূন ২৩:১৪]

কুরআনের অন্যান্য আয়াত পর্যালোচনা করলে বুঝে আসে নুতফাহ হচ্ছে শুক্রাণু। এটি পরবর্তীতে আলাক্বহ’তে পরিণত হয়। علقة এর অর্থ জমাট রক্ত, সংযুক্ত, ঝুলন্ত ইত্যাদি। শুরু দিকে আলাক্বহ অর্থ জমাট রক্ত করা হত। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে, মাতৃগর্ভের ভ্রূণের যে ক্রমবিকাশ হয়, তাতে প্রথম দিকে পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জরায়ুর গায়ে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এ হিসেবে আলাক্বহ হল সম্মিলিতরূপে শুক্র ও ডিম্বাণুর জরায়ু-সংলগ্ন সেই অবস্থার নাম।

- **ইসলাম বিজ্ঞানকে পূর্ণতা দান করে**

বিজ্ঞান মানবজাতির জন্য এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কিছু তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান যে সব ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ক্ষেত্রে সে শুধু “কীভাবে” (How) ব্যাখ্যা করতে পারে অর্থাৎ, ঘটনাটি কিভাবে ঘটলো। কিন্তু কারণ সম্পর্কে সে কোনো ব্যাখা

দিতে পারে। যখন এর সাথে ইসলামী জ্ঞান যুক্ত হয় তখন "কেন" (Why) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

- **বিজ্ঞানকে ইসলাম নৈতিক কাঠামো প্রদান**

বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার এমন এক হাতিয়ার যার ভালো-খারাপ উভয় দিকই রয়েছে। আর শয়তান তো এই উদ্দেশ্য নিয়েই থাকে যে কিভাবে সে মানুষকে বিপথগামী করবে। যদি আল্লহ ও পরকালের ভয় না থাকে তাহলে কোনো অবস্থাতেই বিজ্ঞানকে খারাপ কাজে ব্যবহার রোধ করা যাবে না।

- **ইসলাম বিজ্ঞানবিরোধী নয়; বরং বিজ্ঞান-উৎসাহদাতা**

কুরআনে ৭৫০ এর অধিক আয়াতে প্রকৃতি, মহাবিশ্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জলবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা–গবেষণার আহ্বান এসেছে। ইসলাম বলে—আল্লাহর সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করো, কারণ তাতে স্রষ্টার নিদর্শন প্রকাশ পায়।

اِنَّ فِىۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الۡاَلۡبَابِ ۚۙ ◑ الَّذِيۡنَ
يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰى جُنُوۡبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُوۡنَ فِىۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ رَبَّنَا مَا
خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبۡحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল বুদ্ধিমানদের জন্য; যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি (এমন ফজুল কাজ থেকে) পবিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। [আলে ইমরান ৩: ১৯০-১৯১]

অষ্টম অধ্যায়: ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি

ইসলাম মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদানকারী একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য - শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক - একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ

অর্থঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম, ২২৩)

ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি কেবল ধর্মীয় আচার ভাবলে ভুল হবে। বরং এটি মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রণয়নকৃত গভীরভাবে যুক্তিসংগত ও বৈজ্ঞানিক নীতিমালা।

৮.১ ইসলামী স্বাস্থ্যবিধির পরিচয়

ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি বলতে বোঝায় মানুষের শরীর, মন, নৈতিকতা ও পরিবেশকে পবিত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত নিয়মসমূহ। এর মূল উপাদানগুলো হলো:

- **শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা:** ইসলামে তাহারাত বা পবিত্রতা শুধুমাত্র বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা নয়। এটি অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মার বিশুদ্ধতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ওযু, গোসল, পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখা এবং হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা - সবই তাহারাতের অংশ। পবিত্রতা শারীরিকভাবে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং আধ্যাত্মিকভাবে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

- **হালাল খাদ্যব্যবস্থা:** ইসলাম বৈধ (হালাল) খাদ্য গ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। হালাল খাদ্য মানুষের শরীর সুস্থ রাখে, মনকে সতেজ রাখে এবং নৈতিকভাবে বিশুদ্ধ জীবন-যাপনে সহায়তা করে। হারাম খাদ্য যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, তেমনি মানসিক ও নৈতিক দুর্বলতাও বৃদ্ধি করে।

- **পরিমিতি ও আত্মসংযম:** খাদ্য, পানীয়, খরচ ও দৈনন্দিন আচরণে পরিমিতি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। অতিরিক্ততা ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি রোধ করা যায়। আত্মসংযম মানুষকে নৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত করে।

- **নৈতিক ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতা:** ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজকে নৈতিক ও সামাজিকভাবে শুদ্ধ রাখার ওপর জোর দেয়। সততা, দয়া, দান-সদকা, প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা প্রভৃতি সুন্নাহ'র অনুশীলন সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

- **রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা গ্রহণ:** ইসলাম শারীরিক সুস্থতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, ব্যায়াম ও সঠিক জীবনধারা অপরিহার্য। প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণও সুন্নাহ।

- **সুন্নাহ লাইফস্টাইল:** সর্বোপরি, সুন্নাহ লাইফস্টাইল অনুসরণের মাধ্যমে একজন মানুষ মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে।

৮.২ সুন্নাহ লাইফস্টাইল

বর্তমান যুগের একটি জনপ্রিয় শব্দ হচ্ছে লাইফস্টাইল (lifestyle)। উইকিপিডিয়ার মতে, লাইফস্টাইল হলো একজন ব্যক্তি, দল বা সমাজের জীবনযাপন, অভ্যাস, মনোভাব, পছন্দ-অপছন্দ, মূল্যবোধ এবং আচরণের সমষ্টি। এটি একটি নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে বোঝায়, যা তাদের আগ্রহ, মতামত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ এবং জীবনযাপনের পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুন্নাহ লাইফস্টাইল হলো সেই জীবনধারা যা আল্লহর রসূল ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

স্বার্থপর এই দুনিয়ায় সবাই আশ্চর্যরকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সদাচারণ, সত্যবাদিতা - এসকল গুণকে এখন আর চারিত্রিক অলংকার নয় বরং একরকম দূর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ভালো লোকের পয়সা নাই জাতীয় কথাবার্তায় সমাজ পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কেউ ভালো হতে চাইলেও তার দিকে বাঁকা চোখে তাকানো হচ্ছে, আসলেই এর উদ্দেশ্য ভালো তো? কি মুশকিল! শান্তিপূর্ণভাবে ভালো থাকাও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে আল্লহর রসূল ﷺ এর কথা, কাজ, জীবনদর্শন হতে পারে আমাদের জন্য শান্তির পরশমনি। এখানে ভালো হতে কোনো বাঁধা নেই। বরং, আল্লহর রসূল ﷺ তাঁর প্রিয়

উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখে। যেমন তিনি বলেন,

ظنوا بالمؤمنين خيرا

অর্থঃ তোমরা মুমিনদের ব্যাপারে সুধারণা রাখো। (তাফসীরে কাবীর ১৪/১৩৪)

সুন্নাহ হলো -

- **ভালো কথা বলা**

  নবী ﷺ বলেছেন:

  وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .متفق عليه

  অর্থঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" [বুখারী ও মুসলিম]

- **অপরকে সহায়তা করা**

  যার পক্ষে যেভাবে কারও সাহায্য করা সম্ভব, তার উচিত সেভাবেই তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভার্থে তিনি আমাদেরকে বিভিন্নভাবে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজে তো জীবনভরই এ কাজে আন্তরিক থেকেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

  والله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

  অর্থঃ বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে লেগে থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য করতে থাকেন। (মুসলিম, ৭০২৮; তিরমিযী ১৪২৫)

- **গীবত ও চোগলখুরী পরিহার**

  হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

  لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

  অর্থঃ চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। (আদাবুল মুফরদ, ৩২২)

- **সদাচারণ**

  খাদ্যের মজা ও স্বাদ যেমন লবণ ছাড়া সম্ভব না তেমনি মুচকি হাসি ব্যতীত অন্তরে প্রভাব বিস্তার করাও অসম্ভব। আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ আমাকে বলেছেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ .رواه مسلم

অর্থঃ ভাল জিনিস অল্প হলেও তুচ্ছ মনে কর না; যদিও মৃদু হাসি দ্বারা তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করাও হোক না কেন। (মুসলিম)

- **অন্যের কথা মনযোগ দিয়ে শোনা**

নবী ﷺ যখন কারো কথা শুনতেন তখন তিনি পূর্ণ শরীর তার দিকে ঘুরিয়ে মনযোগের সাথে তার কথা শুনতেন। কখনো কারো কথা না শুনে মধ্যখানে কেটে দিতেন না। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত বক্তার কথা বলা বন্ধ না হত ততক্ষণ তিনি কথা বলতেন না।

- **কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেয়া**

নবী ﷺ বলেছেন:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

অর্থঃ আল্লাহর নিকট সবচয়ে প্রিয় মানুষ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের সর্বাধিক উপকার করে।" (সহীহুল জামে', ১৭৬)

- **অন্যদের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখা**

এ জন্য প্রয়োজনে তাদের জন্য অজুহাত পেশ করা যে হয়ত কোনো অসুবিধায় আছে তাই এমনটা করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ:) বলেন, “মুমিন ব্যক্তি তার ভাইদের ওজর তালাশ করেন আর মুনাফেক তালাশ করে ভুল-ত্রুটি।”

- **কুদৃষ্টি পরিহার**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان فمن تركها مخافتي أعقبته عليها إيمانا يجد طعمه في قلبه

অর্থঃ কুদৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর। যে আমার ভয়ে তা বর্জন করবে আমি এর বিনিময়ে তাকে এমন ঈমান দান করব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে। (আত-তারগীব ৩/২৩)

- **লোক-দেখানো অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকা**

আজকাল মানুষ অন্যকে হাসানোর জন্য নতুন নতুন কৌতুক তৈরি করে। শুধু মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তাদের জানা থাকা উচিত, ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলতে নেই। রাখাল বালক ও বাঘের গল্প আমাদের সবারই জানা। হাদীসে আছে,

كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذ

অর্থঃ এটি খুব বড় খেয়ানত যে, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তুমি এমন কথা বলবে, যে বিষয়ে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করবে অথচ তুমি মিথ্যাবাদী। (সুনানে আবূ দাউদ; হা. নং ৪৯৭৩)

- **অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা**

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মূসলমানের ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার ত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম, ৭০২৮; তিরমিযী ১৪২৫)

- **বৃষ্টিতে ভেজা**

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী করীম (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হল। নবী করীম (ﷺ) তখন শরীর থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন। ফলে তাঁহর শরীর মোবারক বৃষ্টিতে ভিজে গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! এমনটি কেন করলেন ? তিনি বললেন, "তা কেবলমাত্রই তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে আসল কিনা, (তাই বরকতের জন্য এরূপ করলাম)। (আদাবুল মুফরদ, ৫৭২)

- **হেলান দিয়ে না খাওয়া**

মহানবী ﷺ কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। আবু হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ এর দরবারে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, "আমি ঠেক লাগানো অবস্থায় কোনো কিছু ভক্ষণ করি না।" (বুখারি, হাদিস ৫১৯০, তিরমিজি, হাদিস ১৯৮৬)

হেলান দিয়ে খাওয়া শুধু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর-ই নয় বরং, অস্বস্তিকরও বটে।

- **খাদ্যের দোষ-ত্রুটি না ধরা**

আমাদের অনেককে দেখা যায় খাবারের মধ্যে নানা রূপ দোষ-ত্রুটি ধরতে। এ নিয়ে আমাদের পরিবারগুলোতে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে দেদার। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

বিচ্ছেদের মতো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটছে। অথচ রাসুল ﷺ তাঁর পূর্ণ জিন্দেগিতে কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) কখনো খাবারের দোষ-ক্রটি ধরতেন না। তাঁর পছন্দ হলে খেতেন আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ৫১৯৮, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৩৮২)

সময় ও সুযোগ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এ আলোচনা এতটুকুতেই শেষ করা হল। আল্লহ আমাদেরকে সুন্নাহ মোতাবেক জীবন গড়ার তওফিক দিন। আমীন।

৮.৩ হালাল ও হারাম

আল্লাহ মানুষের কল্যাণে যেসব জিনিস বৈধ করেছেন - যা পবিত্র, উপকারী ও নিরাপদ - সেগুলো হালাল। পক্ষান্তরে, যেসব বিষয় মানুষের দেহ, মন, পরিবার বা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে - আল্লাহ সেগুলোকে হারাম করেছেন।
কুরআন এসেছে,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ الۡخَبٰٓئِثَ

অর্থঃ (নবী ﷺ) তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবেন ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবে [সূরাঃ আল আরাফ ৭:১৫৭]

সুতরাং, যা কিছু উত্তম তা হালাল এবং যা কিছু হালাল তা-ই উৎকৃষ্ট। অপরদিকে, যা কিছু নিকৃষ্ট তা হারাম এবং যা কিছু হারাম তা-ই নিকৃষ্ট।

অন্যত্র আল্লহ বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا كُلُوۡا مِنۡ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যে উৎকৃষ্ঠ বস্তুসমূহ দিয়েছি, তা থেকে (যা ইচ্ছা) খাও [সূরা বাকারাহ: ১৭২]
আল্লহ তা'আলা স্বয়ং পবিত্র, এবং তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন। তাই তিনি মানুষের জন্য যেসব বিষয় অপবিত্র, ক্ষতিকর কিংবা অকল্যাণকর সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন। মূলত হালাল-হারামের বিধান মানুষকে সংকুচিত করার জন্য নয়; বরং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত। কারণ মানুষ নিজের সীমিত জ্ঞানে সবসময় বুঝতে পারে না কোনটি তার দেহ, মন ও সমাজের জন্য উপকারী বা ক্ষতিকর।

এর বাস্তব উদাহরণ হলো শুকরের মাংস। আল্লহ তা'আলা প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে এটি হারাম করেছেন, অথচ আধুনিক বিজ্ঞান সম্প্রতি এসে আবিষ্কার করেছে যে শুকরের দেহে বহু পরজীবী ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা মানুষের শরীরের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ।

এমনকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলামের এই কল্যাণমূলক দিক সুস্পষ্ট। আজকের সমাজে সুদ, ঋণ, ঘুষ এসবকে স্বাভাবিক এবং "উন্নতির শর্ত" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন যে তিনি সুদকে সংকুচিত করে দেন এবং দান-সদকা বৃদ্ধিকে করেন। উন্নত বিশ্বের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ - সুদভিত্তিক অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে মানুষ ঘাড়ে বিশাল ঋণের বোঝা নিয়ে দিন কাটায়। সুদের চাপ থেকে মুক্তি পেতে না পেরে তারা চরম মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে ভোগে। এর ফলে বাড়ছে হৃদরোগ, অবসাদ, মানসিক অস্থিরতা - যা পুরো সমাজের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সুতরাং হালাল–হারামের বিধান মানুষের স্বাধীনতায় বাধা নয়; বরং এ বিধান মানবকল্যাণের জন্যই, যা মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষের প্রতি দয়াবান হয়ে নির্দেশ করে দিয়েছেন। আজকাল মানুষ নিজ উদ্যোগে টাকা-পয়সা খরচ করে ডাক্তারের কাছে যায় একটা ভালো ডায়েট তথা, স্বাস্থ্যবিধির জন্য। অথচ আল্লহ তা'আলা আমাদেরকে বিনামূল্যে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর এবং ভারসাম্য পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি দিয়ে দিয়েছেন। তাই আমাদেরএটি মেনে চলা উচিৎ এবং এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ।

নবম অধ্যায়: ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলামী অর্থনীতি শুধু মুনাফা-নির্ভর বিনিময়ব্যবস্থা নয়; বরং এটি নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামি সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, এবং কুরআন-হাদীসে সৎ বাণিজ্যকে ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যক্তিকে যেমন উপার্জনের সুযোগ দেয়, তেমনই সমাজে ন্যায়সংগত সম্পদবণ্টনের পথও সুগম করে।

৯.১ ইসলামী বাণিজ্যের ভিত্তিমূল

ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া দিকনির্দেশনা মেনে চলা হয়। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা স্বয়ং ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধতা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

কুরআন সরাসরি ঘোষণা করে:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

অর্থঃ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" [সূরাঃ আল-বাকারা ২:২৭৫]

এই আয়াত ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করে। তা হলো, বাণিজ্য বৈধ কিন্তু শোষণ তথা, সুদ/রিবা অবৈধ।

সুদখোরদের সম্পর্কে আল্লহ বলেন,

اَلَّذِيۡنَ يَاۡكُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا كَمَا يَقُوۡمُ الَّذِىۡ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَيۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا

অর্থঃ যারা সুদ খায়, (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, 'ব্যবসাও তো সুদেরই মত। [সূরাঃ আল-বাকারা ২:২৭৫]

এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী তাকি উসমানী (দা.বা.) যা বলেছেন তা হুবহু এখানে তুলে ধরা হলো:

কোন ঋণের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তাকে ‘রিবা’ বা সুদ বলে।

মুশরিকরা বলত, আমরা যেমন কোনও পণ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করি এবং শরীয়ত তাকে হালাল করেছে, তেমনি ঋণ দিয়ে যদি মুনাফা অর্জন করি তাতে অসুবিধা কী?

তাদের সে প্রশ্নের জবাব তো ছিল এই যে, ব্যবসায়-পণ্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তা বিক্রি করে মুনাফা হাসিল করা। পক্ষান্তরে টাকা-পয়সা এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি যে, তাকে ব্যবসায়-পণ্য বানিয়ে তা দ্বারা মুনাফা অর্জন করা হবে। টাকা-পয়সা হল বিনিময়ের মাধ্যম। প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাতে এর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যায় সে লক্ষ্যেই এর সৃষ্টি। মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার লেনদেন করে তাকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম বানানো হলে তাতে নানা রকম অনিষ্ট ও অনর্থ জন্ম নেয় (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে ‘রিবা’ সম্পর্কে আমি যে রায় লিখেছিলাম, তা দেখা যেতে পারে। ‘সুদ পর তারীখী ফয়সালা’ নামে তার উর্দূ তরজমাও প্রকাশ করা হয়েছে)।

কিন্তু এস্থলে আল্লাহ তাআলা বিক্রি ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনার পরিবর্তে এক শাসকসুলভ জবাব দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন বিক্রিকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এর তাৎপর্য ও দর্শন জানতে চাওয়া এবং তা না জানা পর্যন্ত হুকুম তামিল না করার ভাব দেখানো একজন বান্দার কাজ হতে পারে না।

প্রকৃত ব্যাপার হল, আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুমের ভেতর নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেরই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে প্রথমেই তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশান্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে, তাতে কোনও দোষ নেই। দোষ হচ্ছে সেই হিকমত উপলব্ধি করার উপর হুকুম পালনকে মূলতবী রাখা, যা কোনও মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।

নবী, সিদ্দিক তথা, অত্যন্ত সত্যবাদী এবং শহীদদের কাতারে উন্নীত হতে কে না চায়! রসূল ﷺ ঘোষণা দিয়েছেন যারা সৎভাবে ব্যবসা করবে তারা এই পুরষ্কার লাভ করবে। তিনি বলেন,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

অর্থঃ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিনে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। (তিরমিযী, ১২০৯)

এটি সৎ বাণিজ্যকে উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করে।

সম্পদ চিরকাল-ই মানুষের জন্য এক অমোঘ আকর্ষণের নাম। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় সম্পদের লোভ যেন মানুষকে আছন্ন করে রাখতে না পারে কুরআনে তাই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَاَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ

অর্থঃ জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। [সূরাঃ আনফাল ৮:২৮]

এমনকি এর লোভে সে তার পরিবার-পরিজন, নীতি-নৈতিকতা, দুনিয়া ও আখিরাত সবই ভুলে বসে থাকে। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এমন হোক, এটা আল্লহর কাছে পছন্দনীয় নয়। তাই তিনি কুরআনের বহু স্থানে মানুষকে সতর্ক করেছেন, সম্পদের প্রাচুর্যের পেছনে না ছুটতে। কুরআনে তিনি একটি সূরাই নাযিল করেছেন যার নাম اَلتَّكَاثُرُ যার অর্থ প্রাচুর্যের প্রতিযোগীতা।

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ ◑حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ ◑كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ

অর্থঃ (পার্থিব ভোগ সামগ্রীতে) একে অন্যের উপর আধিক্য লাভের প্রচেষ্টা তোমাদেরকে (আখিরাত সম্পর্কে) উদাসীন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছ। কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। [সূরাঃ আত-তাকাছুর ১০২: ১-৩]

৯.২ বিক্রেতার দায়িত্ব

ইসলাম দাবী করে একজন মুসলমান ব্যবসায়ী তার পক্ষ থেকে ব্যবসাকে সুষ্ঠু ও সৎভাবে পরিচালনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং লাভ-ক্ষতির বিষয়ে আল্লহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। বিক্রেতার কিছু দায়িত্ব এখানে তুলে ধরা হলো:

- **সঠিক ওজন- পরিমাপ**

  বিক্রিত পণ্যের ওজন বা পরিমাণ যেন সঠিক হয় সে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে এসেছে,

  وَيٰقَوۡمِ اَوۡفُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ

  অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পরিমাণ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করবে। মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দেবে না. [সূরাঃ হুদ ১১:৮৫]

- **ত্রুটি গোপন না করা**

  পণ্যের ত্রুটি গোপন করা যাবে না। যে নিবে, সে জেনে, তারপর নেয়ার সিদ্ধান্ত নিবে। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي " .

  অর্থঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। তিনি স্তুপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন ফলে হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলো। তিনি বললেন, হে স্তুপের মালিক! এ কি ব্যাপার?

  লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে।

তিনি বললেন, সেগুলো তুমি স্তূপের ওপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি ধোকাবাজি করে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (মুসলিম, ১০২)

- **কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি নিষিদ্ধ**

মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাদলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউ মজুতদারি করে না। (ইবন মাজাহ, ২১৫৪)

- **পরিমাণে বেশি দেয়া**

ইসলামী বাণিজ্যের ভুল বসা একটি মুস্তাহাব আমল হলো পরিমাণে বেশি দেয়া। ক্রেতাও বেশি পেলে খুশি হয় এবং মন ভরে বিক্রেতার জন্য দুআ করে। আজও সৌদি আরবের ব্যবসায়ীদের মাঝে এই সুন্নাহটি পরিলক্ষিত হয়।

- **চুক্তি লিখে রাখা এবং সাক্ষী রাখা**

ইসলাম বলে, যখন কোনো চুক্তি করবে তা লিখে রাখবে। চুক্তি হতে হবে স্পষ্ট যেন তাতে সন্দিহান হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে। এটি আরো নির্দেশ দেয়, সাক্ষী রাখার। যারা আল্লহকে ভয় করে ঐ চুক্তির বিষয়ে সঠিক সাক্ষ্য দিবে এবং তথ্য গোপন বা বিকৃত করবে না। বলা বাহুল্য, আমাদের সমাজে আজ জমি-জমা, সম্পদ-ঋণ ইত্যাদি বিষয়ক যত ঝগড়া-বিবাদ বিদ্যমান, তার মূল কারণ খুঁজলে দেখা যায়, হয় চুক্তি লিখে রাখা হয়নি নতুবা চুক্তির সময় কোনো সাক্ষী উপস্থিত ছিলো না। কোনো ক্ষেত্রে আবার উভয়টি অনুপস্থিত থাকে। অথচ কুরআনে এসেছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ ؕ وَلۡيَكۡتُبْ بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبٌۢ بِالۡعَدۡلِ ۚ
وَلَا يَاۡبَ كَاتِبٌ اَنۡ يَّكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلۡيَكۡتُبۡ ۚ وَلۡيُمۡلِلِ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَـقُّ وَلۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـــًٔا ؕ فَاِنۡ كَانَ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَـقُّ سَفِيۡهًا اَوۡ ضَعِيۡفًا اَوۡ لَا يَسۡتَطِيۡعُ اَنۡ يُّمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهٗ بِالۡعَدۡلِ ؕ وَاسۡتَشۡهِدُوۡا شَهِيۡدَيۡنِ مِنۡ رِّجَالِكُمۡ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُوۡنَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ
وَّامۡرَاَتٰنِ مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنۡ تَضِلَّ اِحۡدٰٮهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحۡدٰٮهُمَا الۡاُخۡرٰى ؕ وَلَا يَاۡبَ
الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوۡا ؕ وَلَا تَسۡـــَٔمُوۡۤا اَنۡ تَكۡتُبُوۡهُ صَغِيۡرًا اَوۡ كَبِيۡرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمۡ اَقۡسَطُ
عِنۡدَ اللّٰهِ وَاَقۡوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدۡنٰۤى اَلَّا تَرۡتَابُوۡۤا اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيۡرُوۡنَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَلَّا تَكۡتُبُوۡهَا ؕ وَاَشۡهِدُوۡۤا اِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيۡدٌ ؕ وَاِنۡ
تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّهٗ فُسُوۡقٌ بِكُمۡ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনও ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও। তোমাদের মধ্যে কোনও লেখক যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে (তা) লিখে দেয়। যে ব্যক্তি লিখতে জানে, সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। আল্লাহ যখন তাকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তার লেখা উচিত। হক যার উপর সাব্যস্ত হচ্ছে, সে যেন (তা) লেখায়। আর সে যেন তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাতে (সেই হকের মধ্যে) কিছু না কমায়। যার উপর হক সাব্যস্ত হচ্ছে, সে যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা (অন্য কোনও কারণে লেখার বিষয়) লেখাতে সক্ষম না হয়, তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায্যভাবে (তা) লেখায়।

আর নিজেদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। যদি দু'জন পুরুষ উপস্থিত না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সেই সকল সাক্ষীদের মধ্য হতে, যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীদেরকে যখন (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) ডাকা হবে, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।

যে কারবার মেয়াদের সাথে সম্পৃক্ত তা ছোট হোক বা বড়, লিখতে বিরক্ত হয়ো না। এ বিষয়টি আল্লাহর নিকট অধিকতর ইনসাফসম্মত এবং সাক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার পক্ষে বেশি সহায়ক এবং তোমাদের মধ্যে যাতে (ভবিষ্যতে) সন্দেহ দেখা না দেয় তার (নিশ্চয়তা বিধানের) নিকটতর। হাঁ, তোমরা তোমাদের মধ্যে যে ব্যবসার নগদ লেনদেন কর, তবে তা না লেখালে তোমাদের কোনও অসুবিধা নেই।

যখন বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রাখবে। যে লেখবে তাকে কোনও কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং সাক্ষীকেও নয়। তোমরা যদি (তা) কর তবে তোমাদের পক্ষ হতে তা অবাধ্যতা হবে। তোমরা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখ। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। [সূরাঃ আল বাকারা ২:২৮২]

তাফসীরে এসেছে, সুদ নিষিদ্ধ করার পর এ আয়াতে বাকী লেনদেনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কারবার যাতে সুষ্ঠুভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে হয়, এটাই তার উদ্দেশ্য। কারও কাছে যদি কারও প্রাপ্য বা দেনা সাব্যস্ত হয়, তবে তার এমনভাবে তা লেখা বা লেখানো উচিত, যাতে কারবারের ধরন পরিষ্কার

হয়ে যায়। সমস্ত কথা তাতে স্পষ্ট থাকা চাই এবং অন্যের হক মারার জন্য কোনও রকম কাটছাঁটের আশ্রয় না নেওয়া চাই।

৯.৩ ক্রেতার দায়িত্ব

একটি লেনদেনকে সফল করার জন্য যেমন বিক্রেতার দায়িত্ব আছে তেমনি ক্রেতারও দায়িত্ব রয়েছে। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা হল।

- **পারস্পারিক সন্তুষ্টি**

  ক্রেতা ও বিক্রেতাকে পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে বেচা-কেনা করতে বলা হয়েছে। অন্যায় করা কুরআনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোন ব্যবসায় করা হলে (তা জায়েয)। [সূরাঃ আন নিসা ৪:২৯]

- **পণ্যের সম্পর্কে ভালোভাবে জানা**

  লেনদেনে অস্পষ্টতা নিষিদ্ধ। তাই ক্রেতার কর্তব্য হল পণ্য সম্পর্কে জেনে নেওয়া। ইবনে উমর (র:) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ ، قَالَ » : لَا ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

অর্থঃ “যদি কেউ খাদ্যশস্য মাপা হতে দেখেও থাকে, তা হলে কি কেনার আগে আবার তা মাপা জরুরি?” তিনি উত্তর দিলেন:
“হ্যাঁ, কেনার আগে তা পুনরায় মাপা (ওজন করা) জরুরি।” (মুসান্নাফে আবী শাইবা, ২০০৬২)

- **ধনী ব্যক্তিও যথাযথভাবে চুক্তি সম্পন্ন করবে**

  ধনী-গরিব সকলকেই নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত পরিমাণে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। নবী ﷺ বলেন:

  مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

  ধনী ব্যাক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা জুলুম। (বুখারী, ২৪০০)

- **মূল্য বেশি দেয়া**

  বিক্রেতাকে যেমন বেশি দিতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে তেমনি ক্রেতাকেও বলা হয়েছে যা চাওয়া হয় তারচেয়ে মূল্য বেশি দিতে যেন বিক্রেতা খুশি হয়ে যায়। উলামাগণ বলেন, এটাই ইহসানের নীতি।

৯.৪ বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত সাতটি[২৬]। সেগুলো হচ্ছে-

1. বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টি
2. ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের বেচাকেনা জায়েজ হওয়া অর্থাৎ উভয়ের স্বাধীন, শরীয়তের বিধানের উপযোগী হওয়া এবং জ্ঞানবান হওয়া
3. বিক্রয়ের জিনিসটির ব্যবহার বৈধ হওয়া অতএব যেসব জিনিস বেচাকেনা জায়েজ নেই তা বিক্রি করা যাবে না যেমন - মদ, মাদক, শুকর ইত্যাদি
4. বেচাকানোর সময় বিক্রিত জিনিস বিক্রেতা বা তার পক্ষ থেকে বিক্রির জন্য অনুমোদিত ব্যক্তির মালিকানায় থাকা
5. বিক্রিত জিনিসটি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা - তার গুণাগুণ জানা ও দেখার মাধ্যমে
6. বিক্রয়ের জিনিসের দাম নির্দিষ্ট থাকা
7. বিক্রয়ের জিনিসটি হস্তান্তরযোগ্য হওয়া সুতরাং পলাতক বা হাওয়াই উড়ন্ত কোন কিছু বেচাকেনা বিশুদ্ধ হবে না

দশম অধ্যায়: ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো এমন একটি শাসনধারা, যা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও ন্যায়-নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে। এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য কোনো রাজতান্ত্রিক আধিপত্য নয় বরং ইবাদাত, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা।

১০.১ ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো

- **সার্বভৌমত্ব আল্লহর**

রাষ্ট্রের নৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্ব মানবের হাতে নয়; বরং আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ بِیَدِهِ الۡمُلۡكُ ۫ وَ ہُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُ ۙ

অর্থঃ মহিমাময় সেই সত্তা, যার হাতে গোটা রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তিমান। [সূরাঃ আল মুল্‌ক ৬৭ঃ১]

- **বিধান আল্লহর**

اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ

অর্থঃ হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। (সূরাঃ ইউসূফ ১২ঃ৪০)

- **মুসলমানদের দায়িত্ব হল আল্লহর হুকুম বাস্তবায়ন**

যে বিষয়ে আল্লহ ও তাঁর রসূল যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন তার বাস্তবায়ন করা।

اِنَّ اللّٰهَ یَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَہۡلِہَا ۙ وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا

অর্থঃ (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা কতই না উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। [সূরাঃ আন নিসা ৪ঃ৫৮]

১০.২ ইসলামী রাষ্ট্রে শাসকের ভূমিকা

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও। [সূরাঃ আন নিসা ৪ঃ৫৯]

এখানে উলুল আমর হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক। ইসলামে শাসকের (খলিফা) ক্ষমতা সীমাহীন নয়; বরং তিনি জবাবদিহিতার অধীন। তার দায়িত্বসমূহ -

- আল্লহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা। যে শাসক আল্লহর আইন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তার আনুগত্য করা জায়েয নয়।
- জবাবদিহিতা ইসলামী রাষ্ট্রে শাসককে সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতার মধ্যে রাখা হয়। শাসক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং জনগণের কল্যাণে আল্লহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য।
- ন্যায় ও সমতা রক্ষা। শাসকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠন। রাসূল ﷺ বলেছেন, “ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিনে আরশের ছায়ায় থাকবে।” (বুখারি, মুসলিম)
- নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ। হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, “এমনকি যদি ইউফ্রাত নদীর তীরে একটি উটছানা মারা যায়, আমি ভয় করি আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবেন।” এটি জননিরাপত্তা, রাস্তা, খাদ্য, চিকিৎসা - এ সব কিছুর প্রতি রাষ্ট্রনেতার দায়িত্বকে তুলে ধরে।

- দুর্নীতি দমন ও স্বচ্ছতা। হাদীসে এসেছে, "যাকে আমরা কোনো দায়িত্ব দেই, তারপর সে যদি কিছু লুকায়, তা খিয়ানাত (خيانت)।" (মুসলিম ১৮৩৩)

১০.৩ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা

- আনুগত্য ও সহযোগিতা। নাগরিক শাসকের প্রতি আনুগত্য করবে যতক্ষণ তিনি আল্লাহর অবাধ্যতা আদেশ না করেন।
- ন্যায় দাবি ও জুলুমের প্রতিবাদ। ইসলামে নাগরিকরা শুধু আনুগত্য করে না, বরং জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। রসূল ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।" (তিরমিজি, ২১৭৪)
- আল্লহর আইন বাস্তবায়নে কাজ করা। কেবল শাসক এক তরফা আইন মানার কাজে রত থাকবে এমন নয়, বরং, মুসলমানরা নিজেরা আইন পালন করবে, নিজ ঘর-পরিবার ও সমাজে যেন আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ফিকির করবে।

১০.৪ অমুসলিম নাগরিক ও তাদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়; বরং তাদের রক্ষা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। তাদের জন্যও আছে নানা সুযোগ-সুবিধা।

- ধর্মীয় স্বাধীনতা। অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় আইন ও বিধি-বিধান স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে।

  لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ

  অর্থঃ দীনের বিষয়ে কোনও জবরদস্তি নেই। [সূরাঃ আল বাকারা ২ঃ২৫৬]
- জান-মালের নিরাপত্তা। রাসূল ﷺ বলেছেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির উপর যুলম করবে বা তার প্রাপ্য কম দিবে কিংবা তাকে তার সামর্থের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করবে অথবা তার সন্তুষ্টিমূলক সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো।" (আবু দাউদ, ৩০৫২)

- ধর্মীয় বিষয়ে বিচার করবে অমুসলিম-ই। সূরা মায়িদার ৪২ নম্বর আয়াতের তাফসীরে মুফতী তাকি উসমানী দা বা বলেন, যে সকল অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক, রাষ্ট্রের সাধারণ আইন-কানুনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও শরীয়ত অনুযায়ী মীমাংসা দান জরুরী। অবশ্য তাদের বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াবলী তথা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে তাদের জজের দ্বারাই রায় দেওয়ানো চাই।

১০.৫ ইসলামী রাষ্ট্রে দণ্ডবিধি

ইসলামী আইনে দণ্ড বা শাস্তি (العقوبة) সাধারণত চার প্রকারে ভাগ করা হয়। যথাঃ

1. হুদুদঃ যে শাস্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কুরআন ও সুন্নাহতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ বিচারক বা রাষ্ট্রপ্রধান এর পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারেন না।
2. কিসাস ও দিয়াতঃ এটি মূলত প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণমূলক শাস্তি। ভুক্তভোগী বা তার পরিবার অপরাধীর প্রতি প্রতিশোধ (কিসাস) নিতে পারে, অথবা আর্থিক ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) নিতে পারে।
3. তা’জিরঃ যে অপরাধের জন্য কুরআন-সুন্নাহ শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়নি বরং তা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের বিবেচনাধীন। সমাজের স্বার্থে ও অপরাধ দমনে বিচারক বা রাষ্ট্রপ্রধান উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করার এখতিয়ার রাখেন।
4. কাফফারা/তাওবাঃ কিছু অপরাধে শরীয়ত নির্দিষ্ট কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) অথবা তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছে। অনেক সময় ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তবে তা তার শাস্তি লাঘব বা মাফের কারণ হতে পারে।

সংক্ষেপে চার প্রকার দণ্ড নিম্নরূপঃ

শ্রেণি	**নাম**	**নির্ধারক**	**উদাহরণ**
১	**حدّ (হাদ্দ)**	কুরআন ও সুন্নাহ	চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান
২	**قصاص و دية (কিসাস ও দিয়াত)**	ভুক্তভোগী / শরীয়ত	হত্যা, আঘাত
৩	**تعزير (তা'জির)**	বিচারক	প্রতারণা, শৃঙ্খলাভঙ্গ
৪	**كفارة / توبة (কাফফারা/তাওবা)**	আল্লহর প্রতি অনুতাপ	কসম ভঙ্গ, ভুল অপরাধ

১০.৬ ইসলামী দন্ডবিধি সম্পর্কে কিছু কথা

কুরআনে আল্লহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ তোমরা কি কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফুরী করছো? অতএব তোমাদের যারাই এমনটি করে তাদের প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চনা ভোগ ছাড়া আর কী হতে পারে? কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন''। (সূরা বাকারা: ৮৫)

অনেক লোককে এমনকি অনেক মুসলমানকেও এমনটা বলতে শোনা যায় যে ইসলামী আইন হচ্ছে বর্বরতা আর ইসলাম হচ্ছে বর্বরত, অমানবিক ইত্যাদি। এর কারণ হিসেবে তারা বলে চুরি করলে অপরাধ হচ্ছে হাত কেটে দেয়া, ব্যভিচার করলে অপরাধ হচ্ছে পাথর ছুড়ে হত্যা

করা কিংবা বেত্রাঘাত করা - এগুলো সব বর্বরতা। আর, তারা এগুলোকে তাদের ইসলামি আইন না মানার কারণ হিসেবে দেখায়।

অথচ শাস্তি ব্যবস্থা যে কোন একটা সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম। অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব আইনে অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। আর সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে কেউ যদি চোর না হয়, যিনা ব্যভিচার না করে তাহলে তো তাকে এসব শাস্তি পেতে হবে না!

ইসলামে এত কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটা যাতে একবার মানুষ এই শাস্তি দেখলে, তাদের মনে যে ভয় কাজ করবে এবং তারা ভুলেও এই কাজ করার সাহস না করে। আর যে করে ফেলেছে সে যেন পুনরাবৃত্তি করার সাহস না করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। বর্তমান সমাজে যে আমরা অহরহ খুন, ব্যভিচার, যিনা, চুরি, ডাকাতি -সহ নানা ফিতনা- ফ্যাসাদ দেখতে পাই তার কারণ ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া।

আল্লহ বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَةَ جَلۡدَةٍ ۪ وَّلَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَةٌ فِيۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ۚ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

অর্থঃ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [সূরাঃ আন নূর ২৪ঃ২]

এই অপরাধগুলো যে কেবল একটা নয়, কয়েকটা পরিবারের জীবন নষ্ট করে দেয়, এটা তো সাধারণ মানুষ-ও বোঝে। সবাই যিনা-ব্যভিচারকারীর দিকে তাকাতে ব্যস্ত, এই পরিবারগুলোর দিকেও তো একটু নজর দেয়া উচিৎ!

চুরি, ডাকাতি, খুন, যিনা, ব্যভিচার - এসব অপরাধের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা সম্যক অবগত। তাই তিনি এই অপরাধের শাস্তি নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হুদুদ, অর্থাৎ, আল্লহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। আর আল্লহ বলেন,

تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَقۡرَبُوۡهَا ؕ

অর্থঃ এসব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। সুতরাং তোমরা এগুলোর নিকটে যেও না। [সূরাঃ আল বাকারা ২ঃ১৮৭]

১০.৭ সেকুলারিজম বনাম ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

বর্তমান সমাজে ইসলামী ইবাদাত - নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ - এগুলোতো মেনে চলা হয় কিন্তু শরীয়তের পূর্ণ বাস্তবায়নে দেখা যায় ব্যাপক অনাগ্রহ। এর উৎপত্তি মূলত পশ্চিমা সেকুলারিজম মতবাদ থেকে।

ইংরেজি অভিধানে secularism শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে:

1. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।
2. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয়।
3. দ্বীনপালনকারী নয়, দুনিয়াবিমুখ নয়

একই অভিধানে secularism শব্দের সংজ্ঞায় এসেছে: "secularism এমন একটি দর্শন, যার বক্তব্য হচ্ছে, চরিত্র-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না"।

'ব্রিটিশ বিশ্বকোষ'-এ দেখলে, সেখানে সেকুলারিজম সম্পর্কে বলা হয়েছে: "সেকুলারিজম একটি সামাজিক আন্দোলন, যার একমাত্র লক্ষ্য মানুষদেরকে পরকালমুখী থেকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়ামুখী করা"।

Encyclopedia Britanica নামের ব্রিটিশ বিশ্বকোষে Atheism বা 'নাস্তিকতা' শিরোনামের অধীন secularism এর আলোচনা এসেছে। তাতে Atheism তথা নাস্তিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

তাত্ত্বিক নাস্তিকতা (إلحاد نظري) ও ব্যবহারিক নাস্তিকতা (إلحاد عملي)

'বিশ্বকোষ' সেকুলারিজমকে দ্বিতীয় প্রকার নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে -

সেকুলারিজম একটি কুফরি দর্শন, তার একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়াকে দ্বীনের প্রভাব মুক্ত করা। সেকুলারিজম একটি মতবাদ, তার কাজ হচ্ছে পার্থিব জগতের সকল বিষয়কে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার নিজের তৈরি বিধান দেওয়া ও সকল স্তরে নেতৃত্ব প্রদান করা।[৪২]

সুতরাং, একজন মুসলমান কখনই, কোন অবস্থাতেই সেকুলারিজমকে মানতে পারে না, সমর্থন করা তো দূর কি বাত!

একাদশ অধ্যায়: ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা

১১.১ বিবাহ

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র বৈধ পন্থা হল বিবাহ। পরিবার গঠন, সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তারের জন্যই বিয়ে ছাড়া আর কোন বিধি সম্মত পথ নেই।

বিয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন পবিত্র ও কলূষমুক্ত হয়ে নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে। এ জন্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করলে আল্লহর চিরাচরিত বিধান এবং নবী ﷺ-এর সুন্নাত হিসেবে বিয়ে করা ফরয আর এ অবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকে সমর্থ না হলে সওম পালন করার বিধান দেয়া হয়েছে। আবার শারীরিক দিক থেকে সমর্থ হলে আর ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশঙ্কা না থাকলে বিয়ে করা মুস্তাহাব। আর যৌবিক চাহিদা শূন্য হলে বিয়ে করা মুবাহ্। আবার এ অবস্থায় যদি মহিলার পক্ষ থেকে তার বিয়ের উদ্দেশ্যই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এরূপ স্বামীর শারীরিকভাবে সমর্থ নারীকে বিয়ে করা মাকরূহ। [38]

কিন্তু যদি কেউ সার্বিক দিক থেকে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও রসূলের সুন্নাতের প্রতি অনীহা ও অবিশ্বাসের কারণে বিয়ে পরিত্যাগ করে, তাহলে সে রসূল ﷺ-এর তরীকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বিয়ের মাধ্যমে সমাজের প্রাথমিক নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০.২ ইসলাম ও একাধিক বিবাহ

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِى الۡيَتٰمٰى فَانۡكِحُوۡا مَا طَابَ لَـكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَةً اَوۡ مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ ذٰ لِكَ اَدۡنٰۤى اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ

অর্থঃ তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, তবে (তাদেরকে বিবাহ না করে) অন্য নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ কর দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে। অবশ্য যদি আশংকা বোধ কর যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে (ক্ষান্ত থাক)। এতে তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি। [সূরাঃ আন নিসা ৪ঃ৩]

এই আয়াতে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো মুসলমান ইচ্ছা করলে একের অধিক বিয়ে (চারের বেশি নয়) করতে পারে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো - তাকে তার স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার অর্থাৎ একই রকম সময়, খাদ্য, বস্ত্র দিতে হবে এবং তাদের একের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া চলবে না। আর যে একাধিক বিয়ে করতে ইচ্ছুক কিন্তু তার মনে হচ্ছে তার স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার বা সমতা রাখতে পারবে না তাহলে তাকে একটি বিয়েতেই সন্তুষ্ট থাকতে বলা হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে, স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আল্লহ মানুষকে সাবধান করে বলেছেন,

وَلَنۡ تَسۡتَطِيۡعُوۡۤا اَنۡ تَعۡدِلُوۡا بَيۡنَ النِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡ فَلَا تَمِيۡلُوۡا كُلَّ الۡمَيۡلِ فَتَذَرُوۡهَا كَالۡمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنۡ تُصۡلِحُوۡا وَتَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا

অর্থঃ তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না। তবে (কোনও একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলন্ত বস্তুর মত ফেলে রাখবে। তোমরা যদি সংশোধন কর ও তাকওয়া অবলম্বন করে চল, তবে (জেনে রেখ), আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরাঃ আন নিসা ৩ঃ১২৯]

উপরের দুটি আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামে চারটি বিবাহ করা বৈধ কিন্তু একটি বিবাহ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং বহু বিবাহে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।[৪৩]

হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তির দুই জন স্ত্রী আছে, কিন্তু তার মধ্যে এক জনের দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" (আহমেদ ২/৩৪৭; আসবে সুনান; হাকিম ২/১৮৬) ইবনে হিব্বান ৪১৯)

অতি উৎসাহী ও আবেগপ্রবণদের জন্য এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি যা অধম আমার উস্তাযের মুখে শুনেছি।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) জীবনে দুইটি বিবাহ করেছিলেন। তার কাছে বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে অনেক হাদিয়া, তোহফা আসত। তার মাঝে যেগুলি

তার ঘরের জন্য সেগুলো দুই বিবির মাঝে সমান ভাবে ভাগ করে দেয়ার জন্য হযরতের একটি দাঁড়িপাল্লা ছিল। সব কিছুতে ওজন দিয়ে সমান দুই ভাগ করে দুই ঘরে পাঠানো হত। এটা কেবল একদিন, এক বেলার কাহিনী না। বরং, প্রতিদিন প্রতিবেলা এই কাজ হত। সুবহানাল্লহ!

একবার কেউ একজন দুটা তরমুজ দিয়ে গেল। সাথী কেউ বললেন, এবারে ভাগ বণ্টনে সুবিধা হবে। দুই ঘরের জন্য ২টা তরমুজ।

হযরতজী বললেন, না ভাই, দুটা তরমুজের স্বাদ যদি ভিন্ন হয়! তারপর দুটা তরমুজকেই দুই ভাগ করে দুই ঘরে একেক তরমুজের এক ভাগ করে পাঠিয়ে দিলেন। - এই হল সেই সমান আচরণ যার কথা আল্লহর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

জেনে রাখা প্রয়োজন, একাধিক বিয়ে কোন সুন্নাহ নয়। এটি একটি জায়েয বিধান মাত্র। আর আল্লহর বিধান অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। তবে হযরতজীর মত ইনসাফ করতে পারলে তবেই, এ বিধান প্রযোজ্য। নতুবা এই বিধান তার জন্য নয়।

দ্বাদশ অধ্যায়: ইসলামে নারী ও পুরুষ

وَّخَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡوَاجًا ۙ

অর্থঃ আর তোমাদেরকে (নর ও নারীর) যুগল রূপে সৃষ্টি করেছি। [সূরাঃ আন্ নাবা - আয়াত নংঃ ৪]

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। যেমন, চাঁদ-সূর্য, রাত-দিন, তেমনি, নারীপুরুষ। আল্লহ তাঁর বিধানে পুরুষের জন্য যে পুরস্কার রেখেছেন, জান্নাত, নারীর জন্য-ও সেই একই পুরস্কার রেখেছেন। কোন তারতম্য করেন নি। কুরআনে এসেছে,

اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ

অর্থঃ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। [সূরাঃ আল হুজুরাত ৪৯ঃ১৩]

বিজ্ঞান বলে, সূর্যের নিজস্ব আলো আছে, চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। এতে চাঁদ হেয় প্রতিপন্ন হয় না, তার গুরুত্ব কমে যায় না। বরং অনেক মানুষের কাছে চাঁদ, সূর্য অপেক্ষা অনেক বেশি প্রিয়। তেমনিভাবে, আল্লহ নারীর উপর পুরুষকে অভিভাবকত্ব দিয়েছেন।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ؕ

অর্থঃ পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। [সূরাঃ আন নিসা ৪ঃ৩৪]

এতে নারীর মর্যাদা কমে যায় না, আর পুরুষের মর্যাদা বেড়ে যায় না। বরং, এটাই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য পরীক্ষা - যে পুরুষ তার অভিভাবকত্ব যথাযথভাবে পালন করে কিনা আর নারীও এই অভিভাবকত্ব মেনে নেয় কিনা।

فَاسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ اَنِّىۡ لَاۤ اُضِيۡعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنۡكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى

অর্থ সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন এবং (বললেন,) আমি তোমাদের মধ্যে কোন আমলকারীর কর্মফল নষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক বা নারী। [সূরাঃ আলে-ইমরান ৩ঃ ১৯৫]

সূর্যের কাজ দিনে আর চাঁদের কাজ রাতে। দুটা মিলে এক দিন। নারী পুরুষ একে অন্যের প্রতিযোগী নয়, বরং সহযোগী, এটা খেয়াল রাখতে হবে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

অর্থ: আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো—তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, এবং তোমাদের মধ্যে তিনি রেখেছেন ভালোবাসা ও দয়া। [সূরা আর-রূম ৩০:২১]

ইসলাম হল সেই দ্বীন যেখানে কন্যা লালন-পালনে বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ কন্যাসন্তান লালন-পালনকারীর জন্য তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন -

এক. জাহান্নাম থেকে মুক্তি,

দুই. জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা এবং

তিন. জান্নাতে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য।

তাই মহান আল্লাহ কাউকে কন্যাসন্তান উপহার দিলে সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের লালন-পালন করা আবশ্যক। কেননা তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড় (প্রতিবন্ধক) হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৩)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ কন্যাসন্তানের লালন-পালনের বিষয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যাসন্তান বা তিনজন বোন আছে, আর সে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছে, তাদের নিজের জন্য অসম্মানের কারণ মনে করেনি, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১২)

সুতরাং, নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব হল আল্লহর হুকুম পালন করা। এতেই দুনিয়াবি কল্যাণ ও আখেরাতি জান্নাত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۡ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا ۡ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (বিধানাবলী পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।[সূরাঃ আল মায়িদাহ ৫ঃ৮]

ত্রয়োদশ অধ্যায়: ইসলামে দাওয়াত ও জিহাদ

১৩.১ দাওয়াত ও তার প্রাসঙ্গিকতা

নিঃসন্দেহে ইসলাম আল্লহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। যে কেউ আল্লহকে মানবে আখিরাতে সে পাবে জান্নাত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। পক্ষান্তরে যে কেউ আল্লহকে অস্বীকার করবে তার জন্য থাকবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

কেউ কি চাইবে তার মা, তার বাবা, তার ভাই, বোন, সন্তান, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী কারো বাড়িতে আগুন লাগুক আর সেই আগুনে সে জ্বলে-পুড়ে মরুক? নিশ্চয় না! তাহলে, এটা জেনেও যে ঈমান না আনলে জাহান্নামের আগুন নিশ্চিত, একজন মুসলমান কিভাবে দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকে?

বিদায় হজের ভাষণে নবীজির সামনে প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ইমাম মালিকের কথা মতে জান্নাতুল বাকিতে অন্তত দশ হাজার সাহাবার কবর রয়েছে। তাহলে বাকি সাহাবীরা কোথায় গেলেন? মক্কা থেকে প্রায় ৬০০০ কিমি দূরের এই বাংলাদেশে ইসলাম কিভাবে আসল? এসবই আমাদের পূর্ববর্তী আকাবিরে দ্বীনের দাওয়াতি মেহনত ও মুজাহাদার ফল।

ইসলামী দাওয়াতের একটাই উদ্দেশ্য - আল্লহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়া। আপনি, আমি করি বা না করি কেয়ামত পর্যন্ত কেউ না কেউ অবশ্যই দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাবেই। এটা আল্লাহর ইচ্ছা।

১৩.২ জিহাদ ও তার প্রাসঙ্গিকতা

ইসলামে জিহাদ কোন সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার নয়, বরং, কেবলই জমিনে আল্লহর হুকুম কায়েম করা। জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে মুক্ত করা -

১। মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লহর দাসত্বে প্রতি
২। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার প্রতি

৩। অন্ধকার থেকে আলোর প্রতি

৪। সকল মত ও ধর্মের নিপীড়ন থেকে ইসলামের ইনসাফের প্রতি[৪৪]

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রঃ) বলেন, দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য -

১। আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা

২। কাফেরদের হাত থেকে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করা

আপনি ফিলিস্তিনের দিকে তাকান। অতদূর দেখতে কষ্ট হলে পুবে মায়ানমার, পশ্চিমে ভারত আর উত্তরে চীনের দিকে তাকান, কিভাবে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে মার খাচ্ছে। এই ঘটনাগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় কেন আজকের বিশ্বে জিহাদ প্রাসঙ্গিক।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ইসলাম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

কলেজ থেকে ফিরার পথে বেসামাল ড্রেসে চামেলী বাসায় ফিরছিল। এমন বেসামাল পোশাকে আবেদনময়ী ভঙ্গিমায় চলাতে তার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এক দল যুবক তার সে মস্তানা চলন দেখে তার উপর হামলা করে তার রাঙা যৌবন লুটে নিল। ধর্ষিতা ও খুন হল চামেলী দুর্ধর্ষ যুবকদলের হাতে। অবশ্য যুবকদলেরও এতে স্বাধীনতা ছিল।

অন্যায়ভাবে অবৈধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করাতে তোমার-আমার স্বাধীনতা আছে। তেমনি ডাকাতেরও স্বাধীনতা আছে ডাকাতি করার। চোরেরও স্বাধীনতা আছে বিনা বাধায় চুরি করার। গাড়িওয়ালার স্বাধীনতা আছে, সে যেদিকে খুশী সেদিকে চালাতে পারে। যখন ইচ্ছা তখন বায়ে অথবা ডাইনে সাইড নিতে পারে। এতে কার কি বলার থাকতে পারে?

স্বামীর স্বাধীনতা আছে ‘গার্ল ফ্রেন্ড’ রাখার, তেমনি স্ত্রীরও স্বাধীনতা আছে বয় ফ্রেন্ড’ ব্যবহার করার। কোন কোন রাত্রি যদি স্ত্রী বাসায় বাস না করে তার সে বন্ধুর বাসায় বাস করে, তবে তাতে স্বামীর প্রতিবাদের কি আছে?

আশা করি এমন স্বাধীনতাকে কোন জ্ঞানী মানুষই বিশ্বাস ও সমর্থন করবে না। যে স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সে স্বাধীনতা হল স্বেচ্ছাচারিতা ও মহা অপরাধ। সংঘর্ষহীন বগাধীন স্বাধীনতা শান্তিকামী মনুষ্য সমাজের অভিপ্রেত বস্তু।

অতএব বাক-স্বাধীনতার অর্থ যা ইচ্ছে তাই বলা নয়, তারও নিয়ন্ত্রণ-সীমা আছে। ন্যায়অন্যায়ের মানদন্ড আছে।
ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এতেও ন্যায়-অন্যায়, পরোপকার, অপরের লাভ-ক্ষতি ও স্বাধীনতার কথাও খেয়াল রাখা জরুরী। মতামতের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই মন্তব্য করবে। বিনা দলীলে যা মন তাই মনগড়া মত প্রকাশ করবে এবং ন্যায়কে অন্যায় বা তার বিপরীত প্রমাণ করার জন্য বিষাক্ত কলম ব্যবহার করবে।

এ বিশ্ব আল্লাহর। তিনিই বিশেষ অনুগ্রহে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তারই আজ্ঞাবহ দাস। অতএব প্রভুর কাছে দাসের স্বাধীনতা আবার কি? সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ।

মানুষের হাতে আর কতটুক ক্ষমতা আছে? আর পূর্ণ ক্ষমতা না থাকলে কি স্বাধীন হওয়া যায়?

পরিশেষে এ বিষয়ে একটি মূল্যবান উপদেশ। একদা এক ব্যক্তি ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবু ইসহাক? আমি বড় গোনাহগার। অতএব আমাকে কিছু নসীহত করুন; যাতে আমি গোনাহ থেকে বিরত হতে পারি।

আবু ইসহাক (ইবরাহীম) বললেন, 'যদি তুমি পাঁচটি উপদেশ গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী আমল কর, তাহলে গোনাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। লোকটি বলল, বলুন।

ইবরাহীম বললেন, 'প্রথম এই যে, আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করলে তুমি তার রুযী খেয়ো না।' লোকটি বলল, তাহলে খাব কি? দুনিয়াতে সবকিছুই তো তারই দেওয়া রুযী!

বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি তার রুযী খাবে, অথচ তার অবাধ্যাচরণ করবে। এটা কি তোমার বিবেকে ভালো মনে হবে। বলল, 'অবশ্যই না।

দ্বিতীয় কি বলুন। বললেন, 'যদি তুমি তার অবাধ্যাচরণ করতেই চাও তাহলে খবরদার তাঁর রাজত্বে বাস করো না।" বলল, এটা তো বিরাট মুশকিল। তাহলে বাস করব কোথায়?

বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি তার রুযী খাবে, তাঁর রাজত্বে বাস করবে, অথচ তার নাফরমানী করবে, এটা কি তোমার উচিত হবে?" বলল, অবশ্যই না।

তৃতীয় কি বলুন। বললেন, 'তার রুযী খেয়ে তাঁর রাজত্বে বাস করেও যদি তার নাফরমানী করতে চাও, তাহলে এমন জায়গায় করো, যেখানে তিনি তোমাকে দেখতে পাবেন না।'

বলল, হে ইবরাহীম! তা কি করে সম্ভব? তিনি তো আমাদের মনের গোপন খবরও জানেন! বললেন, তাহলে তার রযী খেয়ে, তাঁর রাজত্বে বসবাস করে, তার দৃষ্টির সামনে তুমি তার অবাধ্যাচরণ করবে এবং তার জ্ঞানায়ত্তে থেকেও পাপাচরণ করবে, এতে কি তোমার লজ্জা হবে না? বলল, 'অবশ্যই।

চতুর্থ কি বলুন। বললেন, 'মালাকুল মওত যখন তোমার জান কবজ করতে আসবেন, তখন তাঁকে তুমি বলো যে, (আমি স্বাধীন। আমি মরব না অথবা) আমাকে আর ক'টা দিন সময় দিন যাতে আমি খালেস তওবা করে নিয়ে ভালো কাজ করে নিতে পারি। বলল, তিনি তো আমার এ অনুরোধ মেনে নেবেন না। বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তাহলে তওবা করার জন্য যদি তুমি মরণকে বাধা দিতে পার, আর তুমি জান যে, মৃত্যু এসে গেলে আর ক্ষণকালও দেরী করা হবে না, তাহলে। মুক্তির আশা কিরূপে করতে পার?

বলল, 'পঞ্চমটা বলুন। বললেন, কিয়ামতের দিন দোযখের প্রহরিগণ যখন তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হবেন, তখন তুমি তাদের সাথে যেও না। বলল, তারা তো আমাকে ছেড়ে দেবেন না। আমার সে আবেদন তারা মানবেন না। বললেন, তাহলে নাজাতের আশা কেমন করে করতে পার?

বলল, হে ইবরাহীম! যথেষ্ট, যথেষ্ট। আমি এক্ষনি আল্লাহর নিকট তওবা করছি এবং কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

হ্যাঁ, মানুষ সর্ববিষয়ে স্বাধীন নয়। মানুষ তো দাস। মহান স্রষ্টা আল্লাহর দাস। আর এ দাসত্বে আছে তার পরম আনন্দ। এ পরাধীনতায় আছে প্রেমের সুমধুর স্বাদ। প্রেম তো পরাধীনতারই এক নাম। তদনুরূপ ইসলাম প্রগতি ও বিজ্ঞান বিরোধী নয়। বরং ইসলাম সভ্যতা, সংস্কৃতি, চিন্তা, জ্ঞান, গবেষণা, সুস্বাস্থ্য প্রভৃতি সার্বিক প্রগতি ও শক্তির প্রশস্ত ময়দান।

হযরত উমার বলেছেন, 'আমরা সেই জাতি, যে জাতিকে আল্লাহ ইসলাম দিয়ে সুসম্মানিত করেছেন। কিন্তু যখনই আমরা ইসলাম ছেড়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণ করব, তখনই তিনি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। [৪৫]

পঞ্চদশ অধ্যায়: উপসংহার

সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট হয় যে ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়—বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রের জন্য সুশৃঙ্খল দিকনির্দেশ প্রদান করে। ইসলামের মূলভিত্তি—তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও নৈতিকতার শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি—মানুষকে স্রষ্টার সাথে সঠিক সম্পর্ক, নিজের আত্মার সাথে শান্তি এবং সমাজের প্রতি ন্যায় ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে।

ইসলামের নির্দেশনা অন্ধ অনুকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং যুক্তি, প্রমাণ, পর্যবেক্ষণ, নৈতিক সুবিবেচনা এবং মানবকল্যাণ—এই পাঁচটি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে আছে। কুরআন মানুষের চিন্তা, গবেষণা, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানচর্চাকে বাধ্যতামূলক করেছে; নবী ﷺ দেখিয়েছেন সে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। ফলে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, আইন, প্রশাসন, পরিবারব্যবস্থা, অর্থনীতি—সবক্ষেত্রে ইসলাম তার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে।

ইতিহাস সাক্ষী, যখন মুসলমানরা ইসলামের জ্ঞানব্যবস্থা ও নৈতিক দিকনির্দেশকে ধারণ করেছিল—তখন তারা বিশ্বে জ্ঞানের অগ্রদূত, ন্যায়বিচারের মডেল ও সভ্যতার নির্মাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার এই নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হলে অস্থিরতা, ভোগবাদ, নৈতিক সঙ্কট ও মানবিক অবক্ষয় সমাজকে দুর্বল করেছে—যার প্রতিচ্ছবি আজকের সেকুলার ভোগবাদী বিশ্বেও স্পষ্ট।

অতএব, ইসলাম কেন প্রয়োজন?—কারণ এটি মানুষকে কেবল ধর্মীয় পরিচয় দেয় না; বরং একটি সুশৃঙ্খল, ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিময় মানবসভ্যতা গঠনের রূপরেখা প্রদান করে। ইসলাম ব্যক্তির হৃদয় সংস্কার করে, পরিবারকে স্থিতিশীল করে, সমাজকে ন্যায়ের উপর দাঁড় করায় এবং রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল শাসনের কাঠামো দেয়। বর্তমান বৈশ্বিক সঙ্কট—নৈতিক অবক্ষয়, পরিবার ভাঙন, মানসিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, যুদ্ধ ও অন্যায়—এসবের সামনে ইসলাম একটি পরীক্ষিত, যৌক্তিক ও কল্যাণমুখী সমাধান হাজির করে।

অতএব শেষ কথা হলো—
ইসলাম মানবতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক পরিপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কল্যাণমুখী জীবন ব্যবস্থা। এর ধারণা, নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করা শুধু মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য নয়; বরং সার্বিক মানবকল্যাণের একমাত্র স্থায়ী পথ।

তথ্যসূত্র

১। আর-রাহীকুল মাখতুম, শায়খুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রাঃ)

২। কুরআন | মুসলিম বাংলা

৩। আল-কুরআন (অনুবাদ, তাফসীর ও অডিও তিলাওয়াত) - Al-Quran Translation,Tafsir & recitation - Bangla Hadith(বাংলা হাদিস)

৪। ধর্মীয় জনসংখ্যার তালিকা, Wikipedia

৫। সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবনী ১, ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

৬। আইওম সীরাহ শীট

৭। ইসলাম, Wikipedia

৮। https://muslimbangla.com/hadith/34947

৯। মিশকাতুল মাসাবীহ - হাদীস নং ২ | মুসলিম বাংলা

১০। মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, প্রথম অনুচ্ছেদ, সংশ্লিষ্ট আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৭ - ২২

১১। জামে' তিরমিযী, হাদীস নংঃ ৩৫০৭ (আন্তর্জাতিক নং: ৩৫০৭) হাদীসের লিংক:https://muslimbangla.com/hadith/33153

১২। সূরা আল হাশ্‌র, আয়াত ২৪ এর তাফসীর | মুসলিম বাংলা

১৩। মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৩৮৮৯; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীছ নং ৩৭৮৮; আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, হাদীছ নং ৩৯১৭: বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, হাদীছ নং ২৪৫৫; জামে তিরমিযী, হাদীছ নং ১৭০৭

১৪। সহীহ মুসলিম, হাদীস নংঃ ৭২২৫, আন্তর্জাতিক নং: ২৯৯৬

১৫। الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة - দ্বিতীয় মূলনীতি: ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

১৬। সূরা আল বাকারা, আয়াত ৯৮ এর তাফসীর | মুসলিম বাংলা

১৭। https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13247

১৮। আইওএম আকিদা শীট

১৯। মালামিহু ফিত তাজউইদ, পৃষ্ঠা ৩৯

২০। আইওএম হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি শীট

২১। আল-উরজুযাতুল মিইয়্যাহ ফি যিকরি হালি আশরফিল বারিয়্যাহ ﷺ, বাংলা অনুবাদ।

২২। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৪

২৩। তারীখু তাবারী, ইমাম তাবারী, ঘটনা: "قصة السارق الذي احتج بالقدر

২৪। ইসলামবিরোধীদের জবাব - ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব ও সংশয় নিরসন
২৫। নাস্তিক্যবাদ, Wikipedia
২৬। আইওএম ফিকহ শীট
২৭। নামাজ, Wikipedia
২৮। মাসিক আলকাউসার - এটি কি হাদীস : আসসালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন
২৯। সালাতের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা, ফলাফল ও ফযীলত - ১ | সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত
৩০। যাকাতের পরিচয় | দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম [যাকাত অধ্যায়]
৩১। (১৪) যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান মাধ্যম | দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম [যাকাত অধ্যায়]
৩২। যে সকল মালের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় | দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম [যাকাত অধ্যায়]
৩৩। ChatGPT
৩৪। The Benefits of Fasting | Muslim Aid
৩৫। https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=70519
৩৬। প্রশ্ন: ১৮৩৫০ - | মুসলিম বাংলা
৩৭। (5:47) Al-Ma'ida | (৫:৪৭) আল-মায়েদা-অনুবাদ/তাফসীর
৩৮। https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=29587
৩৯। আল্লামা শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
৪০। ইসলামী স্বর্ণযুগ: আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে মুসলিম পণ্ডিতদের অবদান - Islamonweb Bangla
৪১। Musannaf Ibn Abi Shaybah 20062 | A man witnesses food being measured in front of him | English, Urdu, Roman Urdu
৪২। সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা কী?
৪৩। ইসলামবিরোধীদের জবাব - ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব ও সংশয় নিরসন
৪৪। কিতাবুল জিহাদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ)
৪৫। যুবক এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও প্রগতি - ১